হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 10, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, July 2015

এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনেরো আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

(বাণী ও রচনা ঃ নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫২)

মগরাহাটে বাড়ি থেকে অপহৃত নাবালিকা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে ১৫ বছরের এক কিশোরীকে রাতের অন্ধকারে বাবা-মায়ের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল দুষ্কৃতিরা। এব্যাপারে মগরাহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ এখনও ওই কিশোরীকে উদ্ধার করতে পারেনি। অসহায় কিশোরীর বাবা মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অপহৃত কিশোরীর বাড়ি মগরাহাট থানার খাঁপুর গ্রামে। তার বাবা সুভাষ মণ্ডল দিনমজুর। প্রতিদিন গ্রাম থেকে এসে সল্টলেক এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঝাড়ু বিক্রি করেন। তাঁর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। এই অভাবের সংসারেও তিন ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। তিনি জানিয়েছেন, গত ৪মে রাত দেড়টা নাগাদ গোটা বাড়ি বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। সেই সময় চার-পাঁচ জন দুস্কৃতি ঘরে ঢুকে পড়ে। পরে সুভাষবাবু জানতে পারেন ওই দুষ্কৃতিরা বাড়িতে ঢোকার আগে গোটা এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এরপর সুভাষবাবুর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁর ১৫ বছরের নাবালিকা মেয়ে টুকটুকিকে তুলে নিয়ে যায়। টুকটুকি দশম শ্রেণির ছাত্রী। ওই অন্ধকারের মধ্যেও তিনি বাবুসোনা গাজিকে চিনতে পেরেছিলেন। এছাড়া এলাকার কুখ্যাত গুণ্ডা সেলিমের দলের আরও ১০-১২ জন বাবুসোনার সঙ্গে ছিল। দুষ্কৃতিরা তাঁর মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর সুভাষবাবুর চিৎকারে প্রতিবেশীরা বেড়িয়ে এসে দুষ্কৃতিদের তাড়া করে। কিন্তু দুষ্কৃতিরা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যায়। সুভাষবাবুর অভিযোগ স্কুলে যাওয়ার পথে তাঁর মেয়েকে মাঝে মাঝেই উত্যক্ত করত বাবুসোনা। তিনি কয়েকবার প্রতিবাদও করেন।

ঘটনার পরদিনই মগরাহাট থানায় বাবুসোনা গাজির নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সুভাষ মণ্ডল। কেস নং- ২৬৮/১৫। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। অভিযুক্ত

শেষাংশ ২ পাতায়

ডায়মণ্ডহারবারে পুলিশকে আটকে রেখে হিন্দুদের ২৫টি বাড়ি লুট করে আগুন

বিশ্ব জুড়ে যত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটছে তার প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোনও না কোনও মুসলিম সংগঠনের যোগাযোগ প্রমাণিত। তা সত্বেও বলা যাবে না সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মুসলমানরা জড়িত। তা হলেই ধর্মরিপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা প্রতিবাদে গলা ফাটাতে শুরু করবেন। তাঁদের বক্তব্য বেশির ভাগ জঙ্গি সংগঠন মুসলিম পরিচালিত হলেও গোটা মুসলিম সমাজকে এজন্য দোষী করা উচিত নয়। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যম পঞ্চগ্রামের বরপাড়ার ঘটনায় সেই সব বুদ্ধিজীবি, ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা কী বলবেন? সেখানে তো একজনের অপরাধে গোটা গ্রামের হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নিল মুসলিমরা। তাও যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই অভিযোগ প্রমাণিতও হয়নি। শুধু সন্দেহের বশে গোটা গ্রামে অত্যাচার চালাল প্রতিবেশী মুসলিমরা। অভিযুক্তের বাড়ি সহ ২৫টি বাড়িতে লুটপাট ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ যাওয়ার চেষ্টা করলেও তাদের আটকে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতিরা।

জানা গেছে, দুদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর জুলফিকার আলি নামে এক অটোচালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে অনেক দূরের এক খালে। সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ে পঞ্চগ্রামের বাসিন্দা ভোলা ভুঁইঞার ওপর। কারণ জুলফিকার তার পুরনো অটোটি ৫০ হাজার টাকায় ভোলাকে বিক্রি করেছিল। অভিযোগ, ভোলা ১৮ হাজার টাকা দিলেও ৩২ হাজার টাকা বাকি ছিল। তাঁর পরিবারে দাবি ২২ জুন সোমবার সকালে ভোলার কাছ থেকে সেই টাকা আনতে গিয়েছিল জুলফিকার। তার পর থেকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে ডায়মণ্ডহারবার থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। সেই রাতেই পুলিশ ভোলাকে আটক করে। পরদিন সকালে জুলফিকারের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপরই বাসুলডাঙা এবং আশেপাশের শতিনেক মুসলিম ভোলা ভুঁইঞার বর পাড়ার বাড়ি গিয়ে লুটপাট এবং ভাঙচুর করে। ভোলা ভুঁইঞার বাড়ি ছাড়াও আরও

শেষাংশ ৫ পাতায়

হিন্দু সংহতির তৎপরতায় ব্যর্থ ল্যান্ড জেহাদের চক্রান্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার আঁচনার মোড়ে ল্যান্ড জেহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিল হিন্দু সংহতির কর্মীরা। বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমরা যে কৌশলী চক্রান্ত করছে, এখানেও সেই চক্রান্ত শুরু হয়েছে। মন্দিরের সামনের পি ডব্লু ডি-র ফাঁকা জায়গা দখল করে বাসস্থান তৈরি চেষ্টা করছে মুসলিমরা। কিন্তু হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মীদের প্রতিরোধে সেই চক্রান্ত আপাতত ব্যর্থ হয়েছে।

মন্দিরবাজার থানার আঁচনার মোড় হয়ে চলে গেছে লক্ষ্মীকান্তপুর - নামখানা মেন রোড। রাস্তার পূর্বদিকে রয়েছে রাধাগোবিন্দ মন্দির। ছ'বছর আগে সাধু সুশান্ত নস্কর ৩২ শতক জমি কিনে মন্দিরটি তৈরি করেছেন। প্রতিদিন সেখানে নামসঙ্কীর্তন হয়। সম্প্রতি এই মন্দিরের সামনের পিডব্লুডির জমি দখল করে বাসস্থান তৈরির চক্রান্ত করছে মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। এই চক্রান্ত সফল হলে মন্দিরটি রাস্তাথেকে আড়ালে চলে যাবে। লোকবল না থাকায় সাধু সুশান্ত নস্কর বাধা দিয়েও ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় এবং আঞ্চলিক নেতাদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু সব জায়গা থেকে বিমুখ হয়েই তাঁকে ফিরতে হয়। এমনকি স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সাহায্য পাননি। সব জায়গায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি স্থানীয় হিন্দু সংহতির নেতা রাজকুমার সরদারের শরণাপন্ন হন। হিন্দু সংহতির পরামর্শ মত তিনি ডায়মণ্ডহারবার ক্রিমিনাল কোর্টে মামলা করেন। আদালত ওই জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করে। আদালতের এই নির্দেশ হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে মন্দিরবাজার থানার ওসি সোমনাথ দে কে জানিয়ে দেওয়া হয়। থানা যদি এর পরেও কোনও ব্যবস্থা না নেয় তা হলে পরবর্তী ঘটনার জন্য স্থানীয় প্রশাসন দায়ী থাকবে বলে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকলেও অত্যাচার বন্ধ হয়নি। মাঝে মাঝেই মন্দির লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে দুষ্কৃতিরা। এছাড়া সাধু সুশান্ত নস্করকে খুনের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

এবার পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে হিন্দুরা

এত দিন মুখ বুজে সহ্য করেছে হিন্দুরা, কিন্তু আর নয় এবার পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করেছে হিন্দুরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার সরবেড়িয়ার ফকিরতকিয়ার পশুহাট এলাকায় তারই চাক্ষুষ প্রমাণ দেখা গেল। সেখানে পশুহাটের পাশেই রয়েছে একটি শ্মশান। সেই শ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করে শ্মশান সংলগ্ন খালে স্নান করেন শ্মশানযাত্রীরা। কিন্তু ওই খাল এবং শ্মশান সংলগ্ন পশুহাটে বরাবরই আধিপত্য বজায় রেখেছে শাজাহান গাজি। বাম আমলে সে সিপিএমের ছত্রছায়ায় পশুহাট থেকে নিয়মিত তোলা আদায় করত এবং খালে মাছ চাষ করত। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর দল পরিবর্তন করে। এখন সে ওই এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা। শুধু তাই নয় পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য।

ওই শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারর করেন ফকিরতকিয়া ছাড়াও পাশের সরবেড়িয়া, গাববুনিয়ার হিন্দুরা। শ্মশান সংলগ্ন খালটি দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানায় ভরে রয়েছে। কিন্তু শাজাহান গাজি তাতে মাছ চাষ করায় হিন্দুরা তা পরিষ্কার করতে পারছিল না। গত কয়েক বছর ধরেই ওই এলাকায় হিন্দু সংহতির কাজ শুরু হয়েছে। অনেক যুবক হিন্দু সংহতির পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। এর ফলে প্রতিবাদের ভাষা ফিরে পেয়েছে হিন্দুরা। সেই সাহসে ভর করে সম্প্রতি এলাকার হিন্দুরা খালটি পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই

শেষাংশ ৪ পাতায়

হিন্দু সংহতির-র আহ্বানে

১৯৪৬-এর হিন্দু বীর

গোপাল মুখার্জী স্মরণে

১৬ই আগস্ট ২০১৫, রবিবার

কলকাতায় মহামিছিল

সকল হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থক এবং আপামর জাতীয়তাবাদী মানুষকে এই মহামিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

আমাদের কথা

ঐতিহাসিকের কল্পনা ঃ দেশের ভবিষ্যৎ নষ্টের চেষ্টা

গত ১৮ জুন 'দৈনিক এই সময়'-এর সম্পাদকীয়তে ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতি থাপার রচিত 'আর্লি ইণ্ডিয়া ফ্রম দ্য অরিজিনস টু সার্কা ১৩০০ এডি' বইটির এক জায়গায় মহাভারত ও গীতা প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন, যা কাগজে 'ভাবা যাক, কৃষ্ণের বদলে যদি অর্জুনের সারথি হতেন বুদ্ধ, কী বলতেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে' শিরোনামে প্রকাশিত। তিনি মনে করেন বুদ্ধ অর্জুনের সারথি হলে হয়ত অর্জুনকে বলতেন, 'এই যুদ্ধ কি সত্যিই প্রয়োজন? কিসের জন্য তুমি অস্ত্রধারণ করেছ? তুমি হয়ত রাজ্য লাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছ, কিন্তু রাজ্যলাভ যদি কর, তোমার নিকট আত্মীয় এবং জাতিগোষ্ঠীকে হত্যা করেই তা সম্পন্ন করতে পারবে।' অর্থাৎ অর্জুন তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর, অহিংসার পথ অবলম্বন কর। এতেই সকলের মঙ্গল।

সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। রোমিলা থাপার একজন ইতিহাসবিদ, তাঁর অনেক পড়া আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি হয়ত মহাভারত বা গীতা ভালো করে পড়েননি, নয়ত বোঝেননি। মহাভারতের সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে বিচার্য। যুদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘঠিত হয়। অন্যায়-অবিচার যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি হয় সাধারণ মানুষের স্বার্থ - তখনই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। তাই মহাভারতের যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। আর কৃষ্ণই ছিলেন সেই প্রেক্ষাপটে সর্বোত্তম ব্যক্তি। সমকালীন পরিস্থিতিতে বুদ্ধ হতেন একেবারে বেমানান চরিত্র। আর শ্রীমতি থাপারের মতো যদি কল্পনা করে নেওয়া যায় যে মহাভারতের যুদ্ধে বুদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, তাহলে অর্জুন নয় এই অহিংসার বাণী শোনানো উচিৎ ছিল দুর্যোধনকে। তাহলে বোধহয় মহাভারতের যুদ্ধটাই হত না। কিন্তু রোমিলা থাপার উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপালেন। কৃষ্ণকে মহাভারতের যুদ্ধের জন্য দায়ী করলেন, মূল কালপ্রিট দুর্যোধনকে দোষারোপই করলেন না। তাই যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও পথ খোলাই ছিল না। এই যুদ্ধই পরবর্তী ভারতের ইতিহাসের ভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছিল। শ্রীমতি থাপার বোধ হয় এটা স্বীকার করবেন না, কিন্তু এটাই সত্যি।

রোমিলা থাপারকে আর একটি প্রশ্ন, আপনি হঠাৎ কল্পনার আশ্রয় নিতে গেলেন কেন? ঐতিহাসিক তো ইতিহাসের সময়ের সরণীর সত্যদ্রষ্টা। সেখানে যা ঘটেছে তাই তাঁর বিচার্য ও আলোচ্য বিষয়। কল্পনার স্থান তো সেখানে নেই। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' - এব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে 'প্লট' সম্বন্ধে আলোচনাকালে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিকের কাজ হল যা ঘটেছে তাকে নিরপেক্ষ ভাবে তুলে ধরা, আর সাহিত্যিক ঘটনার বাইরে নিজের কল্পনাপ্রসূত ভাবকে ব্যক্ত করতে পারেন। আপনাকে একটা অনুরোধ, আপনি ঐতিহাসিকই থাকুন, সাহিত্যিকের কাজ আপনার না করাই ভাল। এতে একটি চিরাচরিত ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও ভক্তিতে আপনি আঘাত করে বসেছেন। আপনার মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব আছে, আর আপনি নিরপেক্ষ নন। আপনার বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতাদর্শের মধ্যে তার প্রমাণ আগেও পাওয়া গেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে আপনি সুচতুর ভাবে হিন্দুধর্মের মূল ভাবাবেগে আঘাত করেছেন। 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় --'এটাই হিন্দু ধর্মের মূলমন্ত্র। ধর্ম প্রতিষ্ঠা হলেই মানুষের জীবনে শান্তি আসবে, হিংসা অপসৃত হবে, অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সরল সত্যটাকে আপনি অস্বীকার করেছেন। যুদ্ধ তো রামায়ণে আছে, কারবালা প্রান্তরে হয়েছে, ট্রয়নগরীতেও হয়েছে। সব জায়গায় আপনি বাঁশী হাতে বুদ্ধকে নামলেন না কেন? ওই সব যুদ্ধে কি হিংসা চরিতার্থ হয়নি? স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না। আপনার প্রয়াসের মধ্যে চালাকি আছে, তাই এটি কোনও মহৎ কার্য নয়।

আপনি একটি মত প্রকাশ করেছেন যে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং অশোকের ধর্মনীতির ফলে ভগবদ্গীতা রচিত হয়েছিল। অনেক পণ্ডিত নাকি এই নিয়ে গবেষণা করছেন। আমার মতে, আপনার মত তারা সব 'বকপণ্ডিত'-এর দল। বুদ্ধের জন্মের অনেক আগেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। আর আপনার কথা অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ যে সহিংসার বাণী অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন তাই ভগবদ্গীতা। তা হলে বুদ্ধের আগেই তো শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন। এসব মাথামুণ্ডুহীন তথ্য কোন বই ঘেঁটে আপনি বের করেছেন, তা জানালে বিশেষ উপকৃত হব।

আপনার বিচারে আমি গোঁড়া সনাতনপন্থী বলেই বিবেচিত হব। আপনি তরুণ প্রজন্মকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছেন। অথচ মিথ্যার আবরণে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করে তরুণ প্রজন্মের মনে বিভ্রান্তি জাগিয়ে তুলছেন আপনি। একটা জাতি যখন দীর্ঘ পরাধীনতার পর মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, তখন অহিংসার বাণী শুনিয়ে তাকে আবার পঙ্গু করে দিতে চাইছেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতি হিংসার পথে চললেও হিন্দুরা শুধু অহিংসার পথে শান্তির বাণী ভজনা করুক। বুদ্ধ-অশোকের অহিংস নীতির জন্যই বার বার ভারতকে বিদেশী শক্তির কাছে পদানত হতে হয়েছে, একথা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন? তাই আপনার কাছে অনুরোধ অযথা কল্পনার জাল বুনতে চেষ্টা করবেন না। সারা পৃথিবীতে আজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ মানব রূপে (বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন।) পূজিত হন। তাঁকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের নায়ক বলে প্রচার করবেন না। এতে হয়ত আপনার ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধ হবে, কিন্তু আপামর হিন্দু আপনাকে সম্মানের আসনে বসাবে না। অবশ্য আপনি তার যোগ্যও নন।

১ম পাতার শেষাংশ

বাড়ি থেকে অপহৃত নাবালিকা

বাবুসোনা গাজি শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পুলিশ তদন্ত করছে না বলে সুভাষ বাবুর অভিযোগ। বরং টাকা নিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে সুভাষবাবু জানিয়েছেন। অন্যদিকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নিয়মিত চাপ দিচ্ছে বাবুসোনা গাজি এবং তার লোকজন। কিন্তু তাতে রাজি না হওয়ায় পুলিশ এবং আসামী পক্ষের লোকজন সুভাষবাবুকে ভয়ও দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এমনকি তার বাড়িতে এসেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই অবস্থায় কোনও মহল থেকে সাহায্য না পেয়ে সম্প্রতি হিন্দু সংহতির দ্বারস্থ হয়েছেন সুভাষবাবু। সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ তাঁর মেয়েকে উদ্ধারের জন্য সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

প্রবল উৎসাহের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পালিত হচ্ছে ক্ষাত্রশক্তি দিবস

হাওড়া, হুগলীর পর এবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলায় উদ্‌যাপিত হল ক্ষাত্রশক্তি দিবস। গত ১২ জুন ঢোলায় অনুষ্ঠিত হল ক্ষাত্রশক্তি দিবস। প্রত্যন্ত অঞ্চল ঢোলা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সংখ্যালঘুদের অত্যাচারে অতিষ্ট। আতঙ্কের মধ্যে হিন্দুদের দিন কাটাতে হয়। প্রতিবাদ করার মত সাহস নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসীদের নেই। বিক্ষিপ্তভাবে যদিও বা দু'একটি প্রতিবাদ কখনও হয়, তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপে তা নির্মূল করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ঢোলা অঞ্চলের সাধারণ হিন্দু শুধু মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। বর্তমানে অবস্থা কিছুটা পাল্টেছে। বেশ কিছু যুবক হিন্দু সংহতিতে যোগদান করেছে। আর হিন্দু সংহতি মানেই অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। তাই ঢোলাবাসীদের মধ্যে আজ সাহস সঞ্চয় হয়েছে। সেই অঞ্চলেরই শিমুলবেড়িয়া গ্রামে সাধারণ মানুষের উদ্যোগে পালিত হল ক্ষাত্রদিবস।

ঢোলার তরুণ যুবক অর্ণব পণ্ডা, কাকদ্বীপের সৌরভ শাসমলের প্রচেষ্টায় ১২ জুন সকাল থেকে শিমুলবেড়িয়া সহ আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ সভাস্থলে উপস্থিত হন। সেদিন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রায় আড়াই শো মানুষ উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে পৌণ্ডক্ষত্রিয়, কর্মক্ষত্রিয় ও বর্গক্ষত্রিয়ের সংখ্যা ছিল বেশি। গ্রামের মূল মন্দিরে পাশে যে আটচালা আছে সেখানে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। বেলা ১০টার সময় হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ সভাস্থলে উপস্থিত হন। গ্রামবাসীরা সাড়ম্বরে সংহতি সভাপতিকে বরণ করে নেন। উপস্থিত গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষাত্রশক্তি দিবসের তাৎপর্য কী তা তুলে ধরেন তিনি। এরপর বেলা ১১টা নাগাদ যজ্ঞ শুরু হয়। যজ্ঞ শেষে উপস্থিত সকলে মহারাণা প্রতাপ সিংহের প্রতিকৃতিতে ফুল দেন ও যজ্ঞের তিলক কপালে ধারণ করেন। এবার উপস্থিত সকলকে সংহতি সভাপতি শপথ বাক্য পাঠ করান। ক্ষাত্রবীর্যের কথা তুল ধরে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন তিনি। তপন ঘোষের বক্তব্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়। এরপর প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। সংহতি কর্মী অর্ণব ও সৌরভের নিরলস পরিশ্রমে অনুষ্ঠান ছিল ত্রুটিহীন।

গত ২০ মে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ দিবস পালিত হয়। রায়গঞ্জের ভাটোল গ্রামের ডিপ টিউবওয়েল মোড়ে খোলা মাঠে প্যান্ডেল বেঁধে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের রায়গঞ্জ শাখার মহারাজ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ এবং সংঘের বেশ কিছু ব্রহ্মচারী। যজ্ঞানুষ্ঠানে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি ব্রজেন্দ্র নাথ রায়, কার্যকারিণী সমিতির সদস্য প্রসূন মৈত্র এবং কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি। ওই যজ্ঞানুষ্ঠানে ৪৫ যুবক এবং ৫ যুবতী সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এছাড়া গ্রামের পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে একশ'র বেশি সাধারণ মানুষ যজ্ঞে আহুতি দেন।

যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পর পরমপূজ্য স্বামী প্রণবানন্দের ছবির সামনে আরতি করা হয়। শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আরতি হয়। পরে মহারাজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে প্রত্যেক বাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র রাখা উচিৎ-কমপক্ষে তরবারি এবং তীর-ধনুক। এছাড়া মেয়েদের ছোট ছোট অস্ত্র রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। রায়গঞ্জ সহ সারা বাংলায় মেয়েরা যে ভাবে নির্যাতিতা এবং ধর্ষিতা হচ্ছে তা তুলে ধরে মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য এই পরামর্শ দিয়েছেন। মহারাণা প্রতাপ সিংহের ৪৭৫ তম জন্মদিবসে কেন হিন্দু সংহতি ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ দিবস কর্মসূচি নিয়েছে উপস্থিত সকলের কাছে তার ব্যাখ্যা করেন তিনি। মহারাজ বলেন, 'ক্ষত্রিয়রা আজ ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের বাড়ির মা-বোনেরা নির্যাতিত হচ্ছে দুষ্কৃতিদের হাতে। হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে তাই ক্ষত্রিয়দের আজ শপথ নিতে হবে।' উপস্থিত সকলকে মহারাজ নিজেই সংকল্প পত্র পাঠ করান এবং কপালে যজ্ঞের তিলক পরিয়ে দেন।

হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি ব্রজেন্দ্র নাথ রায়, কার্যকারিণী সমিতির সদস্য প্রসূন মৈত্র উভয়েই হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তারা এগিয়ে না এলে মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত্রিয় জাগরণ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে যুবকদের জড়ো করার আহ্বান জানান। দু'জনেই তাঁদের বক্তব্যে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা তুলে ধরেন।

১৯৯৩-এর কলকাতা বিস্ফোরণের নায়ক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত রশিদ খান জেল থেকে ছাড়া পেতে চলেছে

তপন কুমার ঘোষ

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস হল অযোধ্যায়। বিদেশী আক্রমণকারী বাবরের নামাঙ্কিত সেই সৌধের জন্য সারা ভারতের মুসলমানদের বুক কতটা টনটন করে উঠেছিল তা জানা নেই, কিন্তু বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বদলা নিতে দুটি ভয়ঙ্কর মানুষ যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ইতিহাস সেকথা মনে রাখবে। এবং মুম্বই ও কলকাতার মানুষ সেই রক্তের দাগকে কোনও দিন ভুলতে পারবে না। ওই ভয়ঙ্কর মানুষ দুটি ছিল দাউদ ইব্রাহিম এবং রশিদ খান।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বদলা নিতে অত্যন্ত বিস্তৃত ও নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিল মুম্বইয়ের অন্ধকার জগতের ডন শরদ পাওয়ারের প্রিয়পাত্র দাউদ ইব্রাহিম। ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বই শহরে একই সঙ্গে ১৫টি জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে (Serial blast) ৩০০ লোককে হত্যা করেছিল দাউদ ইব্রাহিম। সেই দিনটা ছিল শুক্রবার অর্থাৎ ওদের কাছে পবিত্র জুম্মাবার। ঠিক পরের শুক্রবার ১৯ মার্চ ছিল কলকাতায় প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। সেই প্রস্তুতি খুব বড় আকারে করেছিল তৎকালীন শাসকদল সিপিএমের প্রিয়পাত্র রশিদ খান। আমার বাড়ির কাছেই বৌবাজারে তার বাড়ি। সেখান থেকে আবার লালবাজারের দূরত্ব মাত্র ২৫০ মিটার। রশিদ খান ছিল কলকাতার সাট্টা ডন।

গোটা কলকাতা শহরে যত সাট্টা খেলা চলত তার মাথা ছিল রশিদ খান। প্রতিদিন রাতে সমস্ত সাট্টার বুকিরা বৌবাজারে রশিদ খানের বাড়িতে আসত হিসাব দিতে ও হিস্সা নিতে । হ্যাঁ, লালবাজারের নাকের ডগাতেই এই সাট্টার হেড অফিস চলত - এমনই ছিল বামফ্রন্টের সুশাসন! এছাড়া রশিদ খানের কয়েকটি এয়ারকন্ডিশন রেস্টুরেন্ট ছিল যেগুলিতে গিয়ে ক্লান্তি দূর করতেন বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরা, কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও বড় বড় অফিসাররা। তাই রশিদ খানকে ছোঁয় কার সাধ্যি। এছাড়া রশিদ খানের একটি মস্তান বাহিনী ছিল যাদেরকে সিপিএম ব্যবহার করত বিরোধীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে।

সুতরাং রশিদ খান তখন জ্যোতি বসুর ছাতার নিচে অত্যন্ত আরামে নিশ্চিন্তে এবং দাপট নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস যেন তার রাতের ঘুম কেড়ে নিল ঠিক দাউদ ইব্রাহিমের মত। নিজের এত প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে, নিজের আরাম, বিলাস, নিরাপত্তা ও সাট্টা সাম্রাজ্যকে দাঁওতে চড়িয়ে রশিদ খান বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি করল এই কলকাতার বুকে। ১২ মার্চে মুম্বই বিস্ফোরণের পরের শুক্রবার ১৯ মার্চ কলকাতাকে কাঁপিয়ে দেওয়ার, রক্তাক্ত করে তোলার সমস্ত প্রস্তুতি পাকা হয়েগিয়েছিল। কিন্তু শোনা যায় কলকাত্তাওয়ালি-কালী মা খুবই জাগ্রত। তিনিই কলকাতাকে রক্ষা করেন। তাই ১৯ মার্চের তিন দিন আগে ১৬ মার্চ রাতে বিপুল বিস্ফোরণে উড়ে গেল বৌবাজারের রশিদ খানের পাশাপাশি দুটি বাড়ি। নিহত হল শতাধিক। অধিকাংশই সাট্টার বুকি। অবশ্য কারচুপিতে সুদক্ষ জ্যোতি বসুর সরকার মৃতের সংখ্যা কমিয়ে ৬৯ দেখিয়েছিল। আহতের কোনও হিসাব নেই।

সেদিন ওই দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণটা না ঘটে গেলে ১৯ মার্চ বিস্ফোরণের তালিকায় কোন কোন লক্ষ্যবস্তু ছিল তা জানি না। তবে হাওড়া, শিয়ালদা, ধর্মতলা প্রভৃতি জনবহুল এলাকাগুলি ছাড়াও রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার এবং রশিদ খানের বাড়ির কাছে যোগাযোগ ভবন সেই তালিকায় ছিল বলে আমার সন্দেহ। নিশ্চয়ই গোয়েন্দা দফতরের ফাইলে সেই সব ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বামফ্রন্টের পরে আরও এক মুসলিম তোষণকারী ও মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মমতা ব্যানার্জীর সরকার আসায় সেই সব ষড়যন্ত্রের কথা চাপা পড়ে আছে। ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বইয়ের মত ১৯ মার্চ কলকাতায় পরিকল্পিত বিস্ফোরণ সফল হয়ে গেলে তা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-কে স্মরণ করিয়ে দিত। সেই ১৬ আগস্টের ঠিক একবছর পর যেমন দেশ ভাগ হয়েছিল, তেমনি ১৯৯৩-এর ১৯ মার্চ আর একবার বাংলা বিভাগের প্রক্রিয়ার সূচনা হত কি নাকে জানে।

সেই রশিদ খান! ১৯৯৩-এর ১৬ মার্চ কলকাতা বিস্ফোরণের নায়ক সেই রশিদ খান এখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। বিচারাধীন নয়। অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পর কোর্ট দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত। শতাধিক মানুষের হত্যার জন্য দায়ী হলেও রশিদ খানের প্রাণদণ্ড হয়নি, ফাঁসি হয়নি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। হেতাল পারেখ নামে এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্ত জনৈক ধনঞ্জয় চ্যাটার্জীর ফাঁসির দাবিতে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য রাস্তায় নেমে মিছিল করেছিলেন। কিন্তু রশিদ খানের ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় নামা তো দূরের কথা, একটা আওয়াজও শোনা যাবেনা আমাদের এই বাম সেকুলার বাংলায়। কিন্তু সেই রশিদ খান এখনও জেলে পড়ে আছে, এতে যে একটি সম্প্রদায়ের প্রাণে বড় ব্যথা লাগে যে সম্প্রদায়ের ভোটের ভিখারি সব রাজনৈতিক দলই। ডান থেকে বাম, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি কেউই বাদ নয়। আর বর্তমানে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাপারে সব থেকে এগিয়ে মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর দল। তারাই এখন সরকারি ক্ষমতায়। মুসলমানদের প্রাণের ব্যাথা মনের জ্বালা জুড়ানোর সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন? ইমামভাতা থেকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ওবিসিদের জন্য প্রদত্ত শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের প্রায় পুরোটাই ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিমদের দেওয়া, মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিপুল পরিমাণ স্টাইপেন্ড, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় - এত কিছু করেও ওদের মন পাওয়ার ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জী নিশ্চিন্ত নন। আরও অনেক কিছু দিতে হবে ওদের জন্য। তাই তো পুলিশ অফিসার তাপস চৌধুরীকে হত্যা করেও মুন্না ইকবাল আজ মুক্ত বিহঙ্গ। সেলিম, খোঁড়া হাসেম, আরাবুল, শওকত মোল্লা, মজিদ মাস্টার - এরা কেউ জেলে নেই। তাও প্রাণে বড় ব্যাথা, রশিদ ভাই যে জেলে আছে! হোক না সে হত্যাকারী, সে যা করেছিল নিজের স্বার্থে তো করেনি! ইসলামের সেবার জন্যই তো করেছিল! তার এত বড় সাট্টা সাম্রাজ্যের এত প্রভাব প্রতিপত্তি - সব কিছু সে বাজি রেখেছিল ইসলামের সেবা করার জন্য। সেই ধার্মিক মানুষটি এখনও জেলে - এ যে বড় ব্যাথা। সেই মানুষটিকে জেল থেকে ছেড়ে দিলে ৩০ শতাংশ ভোট ব্যাঙ্কের অনেকটাই মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে পাকা হবে- এটাই তো রাজনীতির হিসাব। আর মাত্র এক বছর পর রাজ্যে ভোট। সুতরাং মমতা ব্যানার্জী এই সুযোগকে হাত ছাড়া করতে চাইছেন না। তাই দাগী অপরাধী, কোর্টে সাজাপ্রাপ্ত, ধর্মান্ধ মৌলবাদী রশিদ খানকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রজ্য সরকারের সবরকমের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।

অবশ্যই সরকারি অফিসাররা একটু চিন্তায় আছেন। কারণ যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রশিদ খানকে ছাড়তে হলে অনেক ফাইলে তাঁদেরকেই সই করতে হবে। তাতে পরে আবার তাঁরা বেকায়দায় না পড়ে যান। তখন রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীরা কেউ দায়িত্ব নেবেন না। তাই সরকারি অফিসাররা খুব সাবধানে পা ফেলতে চান। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। কবে রশিদ খান ছাড়া পায় এবং তা মমতাকে ভোট বৈতরণী পার হতে কতটা সাহয্য করে। কিন্তু রশিদ খান ছাড়া পাওয়ার পর মৌলবাদীরা কতটা উৎসাহ পাবে, অপরাধীরা কতটা প্রশ্রয় পাবে, সরকারী অফিসাররা কোন বার্তা পাবেন এবং কোণঠাসা হিন্দুর অবস্থা কী হবে, এসব চিন্তা করার অবকাশ মুসলিম ভোট লোভী মমতা ব্যানার্জীর নেই। এসব কিছুর পরিণাম-পশ্চিমবঙ্গ সবুজ করণের দিকে এগিয়ে চলেছে, রক্ষার কেউ নেই। অনেকেই পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বা বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গ বলা শুরু করে দিয়েছেন।

দাউদ ইব্রাহিম ও রশিদ খান দুজনেই ছিল অন্ধকার জগতের লোক, মাফিয়া ডন, জঘন্য অপরাধী। কিন্তু তারা তো রাজনৈতিক নেতাদের কৃপায় সরকারী প্রোটেকশনে সুখে ছিল! তাদেরকে সুখে থাকতে ভুতে কিলোল কেন? তাহলে আমরা যে বার বার শুনি অপরাধীর কোনও ধর্ম হয় না, সন্ত্রাসবাদীর কোনও ধর্ম নেই, একথাগুলি ঠিক না ভুল? বাবরি মসজিদ ধ্বংসে এদের ব্যবসার তো কোনও ক্ষতি হয়নি! এদের আমদানি ও তোলাবাজিতে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। তাহলে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে এরা এত উতলা হয়ে পড়ল কেন? নিজেদের বিপদ ডেকে আনল কেন? নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে এরা জলাঞ্জলি দিল কেন! তা কি শুধু ধর্মের প্রেরণায় নয়! এবং সেই ধর্ম কি ইসলাম নয়! তাহলে, 'অপরাধীর কোনও ধর্ম হয় না', 'সন্ত্রাসবাদীর কোনও ধর্ম হয় না'- এই কথাগুলি সত্য? না কি আমাদের শুধু বোকা বানানোর জন্য একথাগুলো বার বার বলা হয়! যেদিন আমাদের চোখ খুলবে, সেদিন দেখব পায়ের নিচের মাটি আর একটা ইসলামিক স্থান হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতার আগে ছিল গান্ধীর মুসলিম তোষণ, কংগ্রেসের কাপুরুষতা আর বৃটিশের চক্রান্ত। এখন ওগুলো নেই। কিন্তু যা আছে তা আরও সর্বনাশা- গণতন্ত্রের নামে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি শাসক দল ও বিরোধী দলকে বাধ্য করে কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সমস্ত অনাচার, দুরাচার ও অসংখ্য অপরাধের ঘটনাগুলির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে। এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি দেশে শুধু আইন শৃঙ্খলার সমস্যাই তৈরি করছে না, তা দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থানকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কাশ্মীরের প্রতিদিনের ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই সত্যকে দেখিয়ে দিচ্ছে। এর পরেও যদি সাধারণ মানুষ সজাগ না হয়, যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে আর একবার দেশ বিভাজন কেউ আটকাতে পারবে না। ১৯৪৭-এ আমাদের পূর্বপুরষরা দেশকে এক রাখার জন্য লড়াই করেননি। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খোলা তরবারির সামনে নতি স্বীকার করেছিলেন। এবারও কি আমরা তাই করব? ঘর পোড়া গরুও আকাশে লাল রঙের মেঘ দেখলে ভয় পায়, সাবধান হয়। আমরা সাধারণ মানুষ কি গরুর থেকেও গরু? ৪৭-এ আমাদের ঘর পুড়েছিল। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কি আমরা কিছু প্রস্তুতি করব না? নিজের চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রতিদিনের ঘটনাগুলি একটু লক্ষ্য করুন, তারপর বলুন আমার এই আশঙ্কা ঠিক না ভুল? পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম বিচারের ভার।

বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেল বাংলার ২ কিশোর-কিশোরী

বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েও তা এখন অধরা নদীয়ার শান্তিপুরের সীমা বসাক এবং প্রীতম অধিকারীর। কেবল মাত্র আর্থিক প্রতিবন্ধকতাই এখন তাদের মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই চিনের বেজিং-এ বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পেয়েও তারা এখন হতাশার অন্ধকারে।

শান্তিপুর শরৎকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী সীমা বসাক। বাড়ি শান্তিপুরের ভারতমাতা মোড়ে। গত ১০ মে বারাসতে জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগীতায় সে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস-এর শিরোপা পেয়েছে। এর ফলে আগামী ডিসেম্বরে চিনের বেজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে সে। কিন্তু এই আনন্দের খবরও তার এবং তার পরিবারের কাছে হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই প্রতিযোগীতায় অংশ নিতে গেলে তাকে কম করেও এক লক্ষ টাকা যোগাড় করতে হবে। সীমার বাবা প্রদীপ বসাক একজন সামান্য ব্যবসায়ী। তাঁর রোজগারে কোনও রকমে সংসার চলে। তাঁর পক্ষে মেয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা যোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব। এই অবস্থায় চরম হতাশা গ্রাস করেছে সীমাকে। সে ১৩ বছর ধরে যোগাসন করছে। ২০০৩ সাল থেকে ওম যোগা থেরাপি সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। এর আগেও সে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছে। এবার জাতীয়স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে তার যোগ্যতাকে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। এই অবস্থায় আর্থিক কারণ বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে সে এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

একই অবস্থা শান্তিপুরের আর এক সফল যোগাসন প্রতিযোগী প্রীতম অধিকারীর। প্রীতমের বাড়ি শান্তিপুরের বৈষ্ণবপাড়া শ্যামচাঁদ বাগান লেনে। সে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। ২০০৯ সাল থেকে ওম যোগা থেরাপি সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত সে। বিভিন্ন যোগসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস, রানার্স আপ শিরোপা অর্জন করে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। এবার বারাসতে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সে রানার্স আপ অফ চ্যাম্পিয়ন-এর শিরোপা পেয়েছে। এই যোগ্যতা অর্জনের ফলে সেও আগামী ডিসেম্বরে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে তারও মূল বাধা অর্থ। প্রীতমের বাবা

পাঁচকড়ি অধিকারী একজন তাঁতশিল্পী। তাঁর পক্ষে ছেলের চিনে যাওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা যোগাড় করা অসম্ভব। এই অবস্থায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে ছেলের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন পাঁচকড়িবাবু।

কলকাতায় উদারপন্থী এক মাদ্রাসা শিক্ষককে দাড়ি রাখার এবং টুপি পড়ার ফতোয়া, নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ রাজ্যসরকার

মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতে হলে ফেজটুপি পড়তে হবে এবং দাড়ি রাখতে হবে। এই ফতোয়া জারি করেছে স্থানীয় এক মুসলিম নেতা। ফলে মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ সরকারী অনুদানে চলা এক মাদ্রাসা প্রধানের। এজন্য তাঁকে হেনস্থাও করা হয়। কিন্তু ঘটনার তিন মাস পরেও ওই মাদ্রাসা প্রধানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেনি সরকার। এই ঘটনা কলকাতার ওয়াটগঞ্জ এলাকার। নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ শিক্ষা দফতর ওই শিক্ষককে প্রতিদিন জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিসে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে সংখ্যালঘু কমিশন। কিন্তু কলকাতার পুলিশ কমিশনার লিখিত ভাবে তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, এলাকায় গেলে মাদ্রাসা প্রধান কাজি মাসুম আখতার আক্রান্ত হতে পারেন, এমনকি তাঁর যাওয়া-আসার সময় পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হলেও তিনি হামলার শিকার হতে পারেন। এলাকা এবং স্কুলের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্ন হতে পারে। এই অবস্থায় কাজি মাসুম আখতারকে ওই মাদ্রাসায় পুনর্বহাল করা অসম্ভব মনে করে, তাঁর চাকরি বাঁচাতে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তাভাবনা করছে রাজ্যসরকার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা দফতরের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, 'কোনও সমাধান সূত্র দেখতে পারছি না। আমরা জানতে পেরেছি এলাকার কিছু উগ্র সাম্প্রদায়িক লোকজন কাজি মাসুম আখতারকে বলেছে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতে হলে তাঁকে টুপি পড়তে হবে এবং দাড়ি রাখতে হবে।' এই অবস্থায় আখতার বদলির জন্য আবেদন করেছেন। তাঁর সেই আবেদন শিক্ষা দফতর বিবেচনা করে দেখছে বলে ওই উচ্চপদস্থ কর্তা জানিয়েছেন।

আখতারের আচরণ মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করছে, এই অভিযোগে গত ২৬ মার্চ তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। শিক্ষক হিসাবে আখতারের আচরণ নিয়ে যখন স্থানীয় মুসলিমদের একাংশ ক্ষুব্ধ, সেই ঘটনার তিন মাস আগে স্কুলের পরিচালন সমিতির এক সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্য কথা বলছে। তাঁরা সেরা শিক্ষক হিসাবে রাজ্য সরকারের শিক্ষারত্ন পুরস্কারে জন্য আখতারকে মনোনীত করেছিলেন। ওহ একই সময়ে স্থানীয় একটি ক্লাবের পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় তাঁর ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য সম্বর্ধনাও দেওয়া হয়েছিল।

একসময় যারা সেরা শিক্ষক হিসাবে আখতারকে মনোনিত করেছিল তারাই এখন বিরোধিতায় নেমেছে। 'পরিচালন সমিতির সদস্যরা জানিয়ে দিয়েছেন আখতারকে স্কুলে যোগ দিতে দেওয়া হবে যখন তিনি টুপি পড়বেন, মুসলিমধর্ম অনুযায়ী পোশাক পড়বেন এবং দাড়ি রাখবেন,' জানিয়েছেন আখতারের স্ত্রী রেসিকা আখতার। তিনি কতটা মুসলিম ধর্ম অনুযায়ী আচরণ করছেন তা দেখার জন্য আখতারের ছবি তুলে মেল করে পাঠাতে বলা হয়েছে। সেই ছবি দেখে স্থানীয় এক ধর্মীয় নেতা ঠিক করবেন স্কুলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আখতার ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন কিনা।

সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মণ্ডলের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

আখতারের স্ত্রী জানিয়েছেন, উদার মানসিকতার জন্যই তাঁর স্বামীর এই অবস্থা। ক্লাশ শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করা থেকেই সমস্যার শুরু। রেসিকা জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী বিভিন্ন সময়ে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লিখেছেন। একটি বিশেষ লেখায় তিনি সেই সব মাদ্রাসাকে ভেঙে ফেলার কথা বলেছিলেন, যেখানে জঙ্গি তৈরি হয়। এছাড়া তিনি ওই এলাকার মেয়েদের বাল্যবিবাহ নিয়ে কথা বলেও বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজি মাসুম আখতার কিছু বলতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, 'আমার আশা বাংলার মানুষের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং তালিবানি মানসিকতার এখানে কোনও জায়গা হবে না।' স্কুলের শিক্ষিকাদের শাড়ির পরিবর্তে চুড়িদার পড়ার ব্যাপারে যারা মাঝে মাঝেই সওয়াল করেন তারা এ ব্যাপারে একেবারে চুপ। আর বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমও এনিয়ে চুপচাপ রয়েছে।

১ম পাতার শেষাংশ

এবার পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে হিন্দুরা

মত গত ২১ জুন জনা চল্লিশেক যুবক জড়ো হয়ে খাল পরিষ্কার করে। খাল পরিষ্কার করে সকলেই যে যার বাড়ি চলে যায়। কিন্তু চিন্তা রায় (৩০) নামে এক যুবক পিছনে পড়ে যায়। তাঁকে একা পেয়ে শাজাহানের লোকজন তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। খবর পেয়ে হিন্দু যুবকরা তাড়া করলে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু যুবকরা জীবনতলা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে থানা থেকে জানানো হয় ওসি না থাকায় ডায়েরি নেওয়া সম্ভব নয়। পরদিন সকালে ফের থানায় আসতে বলা হয়। সেইমতো পরদিন থানায় গিয়ে এফআইআর করা হয়।

পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতন, জোর করে যুবতীকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে

ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিভিন্ন রক্ষাকবচের অন্ত নেই। তাদের অধিকার নিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানরা নিজেরা যেমন সোচ্চার তেমনি ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও সবসময় তাদের পাশে রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মুখবুজে সংখ্যাগুরুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

কিছুদিন আগে ইসলামাবাদে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে রিঙ্কল কুমারী নামে ১৯ বছরের এক যুবতী তুলে ধরেছিল তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ওপর মুসলিমদের দাপটের কথা। সিন্ধ প্রদেশের বাসিন্দা ওই যুবতীকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল নাভিদ শাহ নামে এক মুসলিম। নাভিদ শাহ পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর কাছে কেঁদে কেঁদে সুবিচারের প্রার্থনা জানিয়েছিল ওই তরুণী। সেই ঘটনা নাড়া দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের মিডিয়ার কাছে সেই নির্যাতিতা কিশোরী এবং তাঁর পরিবারের ওপর অত্যাচারের ঘটনা কোনও গুরুত্ব পায়নি।

সারা বিশ্বজুড়ে হই চইয়ের পরও কি সুবিচার পেয়েছিল রিঙ্কল এবং তাঁর পরিবার? রিঙ্কল কি ফিরে যেতে পেরেছিল তাঁর বাবা-মায়ের কাছে? না মুসলিম দেশ পাকিস্তানে তেমনটা ঘটেনি। বরং আদালতে সুবিচার চাওয়ার অপরাধে রিঙ্কলের দাদুকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ৭০ বছরের ওই বৃদ্ধকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেনি তারা, নাভিদের লোকজন রিঙ্কলের ছোট ভাই সহ মা-বাবাকেও খুনের হুমকি দিয়েছিল। এর পর ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়, ইসলামাবাদে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে রিঙ্কল বলতে বাধ্য হয় সে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং নাভিদ শাহকেই বিয়ে করবে।

গত ১৩ই জুন শনিবার বড়বাজার লাইব্রেরীতে হিন্দু সংহতির মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শেষে প্রয়াত শম্ভুজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ ও সংহতি কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে শম্ভুজীর পুত্র ও জামাতা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশি তৎপরতায় লাভ জেহাদের হাত থেকে উদ্ধার এক গৃহবধূ

রাত তখন ন'টা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার পোলেরহাট মোড়। অনেকক্ষণ ধরেই সেখানে ঘোরাফেরা করছিল একজোড়া তরুণ-তরুণী। দু'জনেরই বয়স ২০-২১ এর মধ্যে। তাদের চলাফেরা দেখে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হয়। তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছেলেটি জানায় তার নাম আবিদ হোসেন, বাবার নাম আদুস সালাম শেখ। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলা থানার সোদপুকুর এলাকায়। তারা দুই ভাই। সে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দাদা মৌলানা পড়ছে। ঢোলায় তাদের একটি মোবাইলের দোকান আছে। তরুণী তাঁর নাম রিয়া চ্যাটার্জি বলে জানান। এতে পুলিশের সন্দেহ আরও দানা বাধে। তারা দু'জনকেই থানায় নিয়ে যায়।

থানায় নিয়ে গিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের পর তরুণী জানান, তাঁর বাবা সমীর চ্যাটার্জি রেলে চাকরি করতেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি রেলে চাকরি পেয়েছেন। মা-বাবা কেউ না থাকায় বর্ধমানের চৌধুরীবাজার এলাকায় মামার বাড়িতে থাকেন। ঠিকানা ৬২ নম্বর বিবি ঘোষ রোড। মোবাইলের মিসড থেকে আবিদ হোসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এর আগে দু'বার তাঁদের দেখা হয়েছে। প্রথম বার হাওড়া স্টেশনে, দ্বিতীয় বার শিয়ালদায়। এছাড়া নিজেকে অবিবাহিতা বলেও জানান ওই তরুণী। কিন্তু তার অসংলগ্ন কথাবার্তা পুলিশকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই পুলিশ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠায়। তরুণী জানিয়েছিলেন তিনি রেলে চাকরি করেন। কিন্তু পুলিশকে অফিসের ঠিকানা বলতে পারেননি, এমনকি তাঁর কোনও সহকর্মীর নামও বলতে পারেননি। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুই প্রতিনিধি থানায় হাজির হন। এবার তাঁদের সামনে জেরায় তরুণীটি ভেঙে পরেন। জানান, তাঁর বাড়ি হুগলির ডানকুনিতে। তিনি বিবাহিত, দুই সন্তানের জননী। এই ঘটনা ১৪ জুনের। তার চার দিন পর ১৮ জুন ওই তরুণীকে পুলিশ তাঁর স্বামীর হতে তুলে দেয়।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত জামাত সদস্য নুরুল হক

খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডের আট মাস পর ধরা পড়ল জামাত সদস্য নুরুল হক। গত ১৮ মে হাওড়া স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করে এনআইএ। জেহাদি কার্যকলাপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই জামাত জঙ্গি সংগঠনের তহবিল সংগ্রহের কাজ করত। এছাড়া বিভিন্ন মাদ্রাসায় জেহাদি প্রশিক্ষণও দিত সে। এই নুরুল বীরভূম জেলায় জঙ্গি কার্যকলাপ দেখভালের দায়িত্বে ছিল। গতবছরের ২ অক্টোবর বিস্ফোরণের পরই সে পালিয়ে যায়। ডালিম শেখ ধরা পড়ার পর জানা যায় বাংলাদেশের শীর্ষ জামাত নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তার। বাংলাদেশে জামাতের ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের সময় নুরুলের সঙ্গে ডালিমের পরিচয় হয়। জামাতের শীর্ষ নেতার কথামতো সে এরাজ্যে ঢুকে জেহাদি কার্যকলাপ শুরু করে। প্রথম দিকে সে তলহা শেখের সঙ্গে মিশে টাকা সংগ্রহ করত। পরে জেহাদিদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খোলে। ওই সব প্রশিক্ষণ শিবিরে জেহাদি ভাষণ ও ছবি দেখিয়ে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করত। এমনকি অস্ত্র চালানো এবং বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণও দিত সে। তদন্তকারীরা জেনেছে শিমুলিয়া এবং মুকিমনগর মাদ্রাসা থেকে প্রশিক্ষণ শেষ করে বেশ কিছু জেহাদি নুরুল হকের হাত ধরে বাংলাদেশে গিয়েছে। সেখানে আরও উন্নত ধরণের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা। এমনকি তাদের মাধ্যমে বিস্ফোরকও ঢুকেছে এরাজ্যে। নুরুলের মাধ্যমে বিস্ফোরক কোথায় কাদের কাছে পৌঁছেছে তা জানার চেষ্টা করছে এনআইএ-র তদন্তকারী গোয়েন্দারা।

বিশ্বের প্রথম গোবর ব্যাঙ্ক

দুধ উৎপাদনে সাফল্য লাভের পর এবার গুজরাটের আনন্দ এবং খেরা জেলার কৃষকরা গোবর থেকে বায়ো গ্যাস তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। এজন্য ওই দুই জেলার কৃষকরা গোবর ব্যাঙ্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুজরাট প্রোগ্রেসিভ ডেয়ারি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ১৫০০ কৃষক এই গোবর ব্যাঙ্ক তৈরিতে সামিল হচ্ছে । এই প্রকল্পের সঙ্গে ৪০০টি গ্রামকে যুক্ত করা হয়েছে যেখানে গোবর জমা করা হবে। উৎপাদিত বায়োগ্যাস শিল্প-সংস্থায় বাণিজ্যিক ভাবে বিক্রি করা হবে ।

২৬ কেজি গাঁজা সহ ধৃত দুই

গত ১৭ জুন উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগর থেকে ২৬ কেজি গাঁজা সহ দুই দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত এমানুর মণ্ডল এবং আরাফাত মণ্ডল এলাকায় দাগি আসামী বলে পরিচিত। উভয়েরই বাড়ি গোপালনগর এলাকাতে। গোপালনগরের সংহতি কর্মী এই প্রতিবেদককে জানান, পাচারকারীরা বাইকে করে এসেছিল। আগে থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এলাকাটিকে ঘিরে ফেলে তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার, জাল টাকার আমদানি, এমনকি খুনের অভিযোগ রয়েছে।

সর্বকনিষ্ঠ মানববোমা ব্রিটেনবাসী ১৭ বছরের কিশোর

আইসিস কীভাবে সুকুমারমতি কিশোরদেরও সন্ত্রাসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তার সর্বশেষ উদাহরণ ব্রিটেনবাসী তালহা আসলাম। জুনের প্রথম সপ্তাহেই উত্তর বাগদাদে একটি তৈল শোধনাগারের বাইরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিজেকে উড়িয়ে দেয় ওই কিশোর। ওই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে আইসিস জঙ্গি সংগঠন। মানব বোমা তালহা আসলামের ছবিও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে তারা। পুলিশ ওই আত্মঘাতী বালককে ব্রিটেনের বাসিন্দা বলে চিহ্নিত করেছে। কিশোর-কিশোরীদের মনে সন্ত্রাসের বীজ রোপণ করতে সোস্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করছে আইসিস।

১ম পাতার শেষাংশ

হিন্দুদের ২৫টি বাড়ি লুট করে আগুন

তিনটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই দেখে গ্রামের বাকি বাসিন্দারা সব কিছু ফেলে প্রাণ ভয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যান। এরপর গোটা গ্রাম জুড়ে শুরু হয় তাণ্ডব। একে একে সব বাড়ি লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতিরা। গ্রামে যে ক'টি পাকা বাড়ি ছিল সেগুলির দরজা ভাঙতে না পেরে জানালা ভেঙে ফেলে। এরপর কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে দেয়। কয়েকটি বাড়িতে মাড়াইয়ের জন্য জড়ো করে রাখা ধানও পুড়িয়ে দেয় হামলাকারীরা। এই তাণ্ডবের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিলেও ওই পাড়া থকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে পঞ্চগ্রাম প্রমথনাথ স্কুলের কাছে হামলাকারীদের একাংশ তাদের আটকে রাখে। পরে আরও পুলিশ এবং র‍্যাফ এনে ঘটনাস্থলে পৌছলেও ততক্ষণে হামলাকারীরা তাণ্ডব চালিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় জিনিসপত্র সহ গোয়ালে এবং মাঠে বাঁধা গরু-ছাগলও নিয়ে গেছে।

ঘটনার চারদিন পরেও হিন্দু সংহতির কর্মীরা গিয়ে গোটা পাড়ায় শুধু ধ্বংসের চিহ্নই দেখে। চারিদিকে শুধু পোড়া জিনিসপত্র। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মন্দির। অনেক বাড়িতে ছাইয়ের ভিতর থেকে উঁকি মারছে দেবতার ভাঙা মূর্তি। জনশূন্য পাড়ায় বসানো হয়েছে একটি পুলিশ ক্যাম্প। কিন্তু সেই পুলিশও আর নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ভয়ে কেউ এখনও গ্রামে ফেরেননি। আর ফিরবেনই বা কোথায়? জীবনের সব সম্বলই তো শেষ হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন পাশের পাড়ার কোনও স্বজনবান্ধবের বাড়িতে। কেউ চলে গেছেন আত্মীয় বাড়িতে। এলাকায় দেখা হল তপন মণ্ডলের স্ত্রীর সঙ্গে। জানালেন, সেদিন দুপুরে যখন গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ খেতে বসেছে সেই সময় আক্রমণ শুরু হয়। প্রায় শ'তিনেক হামলাকারী পাড়ায় ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আরও শ'দুয়েক মুসলিম। দুষ্কৃতিরা তপন মণ্ডলের বাড়ির সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। তাঁর ভিটেয় এখন পোড়াছাই। আগুনে তাঁর দশ বছরের ছেলের বইপত্রও পুড়ে গেছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ছেলে সুকোমলকে মামার বাড়িতে রেখেছেন। নিজেরা থাকেন পাশের পাড়ার এক পরিচিতের বাড়িতে।

দুষ্কৃতিরা যখন হামলা শুরু করে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই একে একে বাড়ি-ঘর পোড়াতে থাকে। তবে বৃষ্টির কারণে কয়েকটি বাড়ি রক্ষা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। পাড়ায় যাদব বর এবং মিন্টু বরের দু'টি মুদি দোকান ছিল। সেই দোকানদুটির ওপরই এলাকার মানুষ নির্ভরশীল ছিলেন। দুটি দোকানই লুটপাট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুষ্কৃতিরা যা পেরেছে তা নিয়ে গেছে, যা নিতে পারেনি তা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ভানুরাম বর এবং গোপাল দলুইয়ের ধানের পালুই পুড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া বাড়ির জিনিসপত্রের সঙ্গে গরু-ছাগলও নিয়ে গেছে হামলাকারীরা। এই হামলার হাত থেকে বাদ যাননি স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শঙ্কর ভুঁইঞা। তৃণমূল নেতা হলেও হিন্দু হওয়ার অপরাধে তাঁর ঘর-বাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামের যেসব মানুষ অন্য কোথাও যেতে পারেননি তাঁরা গ্রামের হরিমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। দুষ্কৃতিরা মন্দিরের ঘট ভেঙে দিলেও আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মন্দিরটি। ঘটনার পাঁচদিন পরেও এলাকায় আসেননি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রুকসানা বিবি। তবে স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার হরিমন্দিরে আশ্রয় নেওয়া অসহায় মানুষগুলোর জন্য দুপুরে খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছেন। এখনও পর্যন্ত জোটেনি কোনও সরকারি সাহায্য। এই অবস্থায় আতঙ্কিত হিন্দুরা আর এলাকায় থাকতে চাইছে না। অনেকেই জানালেন, জমি বিক্রি করে দিয়ে কোনও হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় চলে যাবেন, মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবেন। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে?

ভারতীয় জাল পাসপোর্ট নিয়ে ঢুকে পড়েছে আড়াই হাজার বাংলাদেশী

এতদিন বিনা পাসপোর্টেই তাদের আসার বিরাম ছিল না। এবার তারা ঢুকছে পাসপোর্ট হাতে। তাও বাংলাদেশী নাগরিক হিসাবে নয়, একেবারে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে। সেই পাসপোর্ট দেখে বোঝার উপায় নেই যে তা জাল। আর ওই জাল পাসপোর্ট দেখিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতে ঢুকে পড়ছে প্রায় আড়াই হাজার বাংলাদেশী। গোয়েন্দাদের অনুমান ওই আড়াই হাজার বাংলাদেশীর মধ্যে বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠনের সদস্যও ঢুকে থাকতে পারে। আর এই তথ্যই এখন মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গোয়েন্দাদের।

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁর হরিদাসপুর সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা বাবন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোয়েন্দারা জানতে পারেন এই চক্রের জাল বাংলাদেশে যেমন আছে তেমনি ভারতের বনগাঁ, কলকাতা এমনকি হায়দরাবাদ এবং উত্তপ্রদেশেও ছড়িয়ে রয়েছে। বাবন চক্রবর্তীর কাজ ছিল জাল পাসপোর্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সংশাপত্র জোগাড় করা। সে ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট, জমির দলিল এবং বাসিন্দা সার্টিফিকেট সহ নানা রকমের সংশাপত্র সরবরাহ করত। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের অন্যতম পাণ্ডা আসরাফুলের নাম জানতে পারেন গোয়েন্দারা। তার বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে বেশ কিছু ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির বরাত দেন গোয়েন্দারা। আসরাফুল জানায় এক একটি পাসপোর্টের জন্য দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা লাগবে। এর জন্য সে কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাতে বলে। উত্তর ২৪ পরগণার গোয়েন্দারা একটা মোটা পরিমাণ টাকা আসরাফুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেন। এরপর পাসপোর্ট তৈরির কাজ এগোতে থাকে। ঠিক হয় নিউ মার্কেট এলাকায় পাসপোর্ট ডেলিভারি দেবে আসরাফুল। সেইমত গত ২৫ মে বনগাঁ বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢোকে সে। গোয়েন্দারা প্রথম থেকেই তার মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশনের ওপর নজর রাখছিলেন। বারাসতের ডাকবাংলো মোড়ে পৌছতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আসরাফুলকে জেরা করে নিউটাউন থেকে ধরা হয় এই জালচক্রের অন্যতম পাণ্ডা প্রশান্ত দত্তকে। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ। এই জাল পাসপোর্ট চক্রের কারবারের দৌলতে সে এখন কয়েক কোটি টাকার মালিক। নিউটাউনে জমি-বাড়ির ব্যবসায় সে এক কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। কিন্তু তার এই জাল কারবার থেকে লোকের দৃষ্টি ঘোরাতে প্রকাশ্যে সিবিএসসির বই সাপ্লাইয়ের কাজ করত।

আসরাফুলের কাছ থেকে গোয়েন্দারা একটি ডায়েরি উদ্ধার করেছে। সেই ডায়েরি তথ্য এবং আসরাফুল ও প্রশান্ত দত্তকে জেরা করে গোয়েন্দারা জানতে পারেন এপর্যন্ত ভারতীয় জাল পাসপোর্ট নিয়ে প্রায় আড়াই হাজার বাংলাদেশী ভারতে ঢুকে পড়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু বাংলাদেশী সৌদি আরব এবং দুবাইয়ে গেছে। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন দুবাই এবং সৌদিআরব এখন বাংলাদেশীদের সহজে পাসপোর্ট দিচ্ছে না। তাই অনেক বাংলাদেশী ভারতীয় জাল পাসপোর্ট নিয়ে সৌদিআরব দুবাই যাচ্ছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন এই আড়াই হাজার বাংলাদেশীদের বেশিরভাগই ভারতের বিভিন্ন অংশে বসবাস করছে। প্রশ্ন এত টাকা খরচ করে কি উদ্দেশ্যে বাংলাদেশীরা ভারতে আসছে। তাঁদের আশঙ্কা এই জাল পাসপোর্ট নিয়ে হয়ত বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের প্রচুর সদস্য এদেশে নাশকতা চালানোর জন্য ঢুকে পড়েছে।

এই তথ্য হাতে আসার পরেই উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারাও তদন্তে নেমে পড়েছে। তাঁদেরও ধারণা যারা ভারতে ঢুকে পড়েছে তাদের মধ্যে জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরাও থাকতে পারে। গত এক বছর ধরে এই চক্রটিকে খুঁজছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাঁরা। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, কলকাতায় জাল পাসপোর্ট তৈরি করে প্রশান্ত দত্ত চট্টগ্রামের আসরাফুলকে দিত। আসরাফুল সেই পাসপোর্ট তার ক্লায়েন্টদের দিত। ভারতীয় নাগরিক সেজে ওই বাংলাদেশীরা পেট্রাপোল, ঘোজাডাঙা এবং গেদে সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢুকেছে। আর হাতে ভারতীয় পাসপোর্ট থাকায় খুব একটা সমস্যায়ও পড়তে হয়নি। এখনও পর্যন্ত যারা এদেশে এসেছে তারা এই রাজ্যেই রয়েছে নাকি অন্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে? সেই ব্যাপারে খোঁজ শুরু করেছেন গেয়েন্দারা।

ডায়মন্ডহারবারের পঞ্চগ্রামে ইসলামিক অত্যাচারের চিত্র

মুসলিম তোষণের রোহিঙ্গানীতি

পবিত্র রায়

মায়নমারের আরাকান এলাকার রোহিঙ্গা মুসলিমরা দেশ ত্যাগ করছে। সুচরিতা সেনগুপ্ত ও মধুরা চক্রবর্তী নামে দ্য ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপের দুই জন গবেষিকা এই রোহিঙ্গাদের বিষয়ে তত্ত্ব-তালাশ করে 'রোহিঙ্গাদের প্রতি দায় আছে আমাদেরও' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন (সূত্রঃ আঃ বাঃ পঃ ০২-০৬-২০১৫)। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে ১৯৪৮ সালে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই উক্ত দেশের গণতান্ত্রিক সরকার এই রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিক হিসাবে মেনে নিলেও পরবর্তীতে সামরিক রাষ্ট্র সেটা অস্বীকার করে। রোহিঙ্গা বিরোধী দাঙ্গায় ছাড় পায়নি অন্যান্য মুসলমানগণ, যাদের নাগরিকত্ব আছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে লেখিকাদ্বয় এতবেশী একচক্ষু সম্পন্ন হয়েছেন যে গবেষণার নামে মুসলিম তোষণকারী হয়ে পড়েছেন। রাখাইনের মেইখটিলা এলাকার পরিবেশগত দিকটা এবং মূল কারণ খোঁজা উচিৎ ছিল।

আসল ঘটনা হল মার্চ ২০১৩ তে প্রথম ব্যাপকার্থে দাঙ্গা শুরু হয়। মূল কারণ ছিল একজন মুসলমান দোকানদার একজন বৌদ্ধভিক্ষু কে খুন করে। তার পরই বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের উপর চড়াও হয়। মসজিদগুলিতে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। জানা যায় ৪৩ জন নিহত ও ৬ হাজার মানুষ থানায় এবং স্টেডিয়ামে আশ্রয় নিয়েছে। মেইখটিলা এলাকটি ইয়াঙ্গন থেকে সাড়ে পাঁচ শত কিমি উত্তরে। এখানকার একলাখ অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। সমুদ্র পথে বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিতে গিয়ে, মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে বহু রোহিঙ্গার করুণভাবে মৃত্যু হচ্ছে, যার ছবিও আমরা দেখতে পেয়েছি। রাষ্ট্রসংঘও বিভিন্ন দেশকে অনুরোধ করেছে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে। প্রঙ্গত সারা মায়ানমারের মোট জনসংখ্যার চার শতাংশ মুসলমান, আর মেইখটিলা এলাকায় রোহিঙ্গা মুসলমান ৩৩ শতাংশ।

দুই একটি প্রশ্ন রাখা দরকার রোহিঙ্গাদের বিষয়ে। ১৯৪৮ সালের পর থেকে এতদিন রোহিঙ্গারা দেশত্যাগ না করে এখন দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে কেন? আর মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নিতে রাজি নয় কেন? আর এত কিছুর মধ্যেও গোপনে এরা কাফের ভারতে আসছে কেন? ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ব্যক্তিগণ বলবেন ওরা ধর্ম রক্ষার জন্য ভারতে আসছে। মেনে নিলাম, তবে প্রশ্নের অবতারণা রয়েই গেল। সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের ধর্মরক্ষা করার ঠিকাদারি কি আমরা নিয়েছি? গত সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশে প্রতিদিন চরম অত্যাচারের শিকার হয়ে যখন হিন্দুরা আপন ধর্ম ও সম্পদ রক্ষা করতে পারছিল না তখন কোথায় ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, উদার ও মহান সমাজতাত্ত্বিকগণ? আইএস যখন কুর্দ ইয়েজিদিদের পাহাড়ে আটক করে খাদ্য-জল ছাড়া মারতে থাকে, কোথায় থাকে সমাজতাত্ত্বিকের মানবতা? মায়ানমারের জাহিরা ভারতে শরণার্থীর মর্যাদা পায়। আর যখন পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ধর্ম ও জীবন বাঁচিয়ে ভারতে এসে রেললাইনের পাশে অসহ্য পরিস্থিতিতে হিন্দুরা বসবাস করে, খ্রিস্টানদের পয়সা পায় এবং নিঃশব্দে খ্রিস্টান হয়ে যায় তখন ধর্মরক্ষা-মানবতা প্রভৃতির কোনও হদিশ পাওয়া যায় না কেন?

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের কথা মনে পড়ে কি? পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু স্রোত মিছিল করে চলে আসছে ভারতে। মূলত সবাই হিন্দু। মাঝে মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মিছিলের উপর সংঘবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করে লুটপাট, খুন-খারাপি করছে। পাকিস্থানের জল্লাদ বাহিনী মিলিটারিরা এই উদ্বাস্তু মিছিলে গুলি চালিয়ে মারছে। ফেলে আসা বাড়িঘর, প্রতিবেশী-একসঙ্গে থাকা মুসলমানরা লুটপাট করে নিয়ে ঘরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এতকিছুর কারণ ছিল হিন্দু হওয়ার অভিশাপ। রোহিঙ্গারা তো একটুমাত্রই অত্যাচার পেয়েছে—তাতেই এত গেল গেল রব কেন?

মুসলমানগণ সামান্য সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারলেই অন্য কোনও ধর্ম ও জাতিকে বিনাশ করতে উঠেপড়ে লাগে। এটা ইসলামের মূল আদর্শ। প্রমাণ হিসাবে গোধরাকাণ্ড, পশ্চিম দিকে পাকিস্তান নামক দেশে হিন্দু অত্যাচার, চিনে ইউঘুরদের ব্যবহার, আইএস-এর ফতোয়া প্রভৃতিকে সহজেই দেখানো যায়। মহম্মদ নিজেও বিভিন্ন ইহুদি গোষ্ঠীদের বলেছিলেন, তোমরা ইসলাম কবুল কর, জানমাল সবই সুরক্ষিত থাকবে। আর তা না হলে দেশত্যাগ অথবা প্রাণত্যাগ কর। মায়ানমারের সামরিক সরকার এতকিছু বলেনি। শুধু বলেছে এদেরকে বর্মী সমাজে মিশে যেতে হবে।

একটু সংখ্যাধিক্য পেলেই মুসলমানরা পার্শ্ববর্তী অন্য জনজাতির লোকেদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, গুপ্ত হত্যায় এদের জুড়িমেলা ভার। অন্য ধর্মের মানুষদের কাফের, মুশরিক, জাহান্নমি ইত্যাদি বলতে থাকে। ক্রমে অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় দাঙ্গার সৃষ্টি হয়, স্বাভাবিকত জয়ী হয় মুসলমানরা। কারণ হল ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ভাবে এদের হত্যা শেখানো হয়, নবিজীর জীবনে বহু হত্যার জীবনদর্শন পড়িয়ে মানসিক ভাবে হত্যার উপযোগী মানসিকতা বানানো হয়। অন্যান্য কোনও ধর্মই এরূপ করে না। মনে রাখা দরকার বর্তমান রোহিঙ্গা বিদ্বেষ শুরু হয়েছে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যার মাধ্যমে। মুসলমানরা বৌদ্ধদের কতটা হেয় মনে করে ও সহজ হত্যাযোগ্য মনে করে সেটা তাদের বিতাড়ন প্রক্রিয়াতেই বোঝা যায়। ভূমধ্য সাগরের তীর থেকে তাড়িয়ে এনে পূর্ব এশিয়ার ছোট ছোট কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ করেছে। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করা, বুদ্ধগয়ায় বিস্ফোরণ, শ্রীলঙ্কায় অতি সামান্য হওয়া সত্বেও বৌদ্ধদের সাথে মারপিটে জড়িয়ে পড়া প্রভৃতি কিসের ইঙ্গিতবাহী? রোহিঙ্গারাও এইরূপ করেনি তো? কেউ পীড়িত হলেই তার সব দোষমুক্তি ঘটে না। সারা পৃথিবীতেই মুসলমানরা শুধুই উৎখাত এবং ধর্মান্তকরণ করেছে। খুব সম্ভবত স্পেনে বিপর্যয়ের পর এই প্রথম উৎখাত যন্ত্রণা রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ পাচ্ছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অহিংস মন্ত্র ছেড়ে অস্ত্র ধারণ করছে দেখে ভাল লাগছে। সহিংসতার জবাব অহিংসায় হয় না এটা ওরা বুঝেছে বোধকরি।

মায়ানমারের নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী নেত্রী সূ চি রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে কোনও কথা বলতেই রাজি হননি। ২০১৩ সালে ব্যাপকার্থে দাঙ্গা শুরুর আগে ২০১২ সালেই প্রথম দাঙ্গার সূচনা। তখন থেকেই সূ চি-র কোনও ভাষ্য নেই রোহিঙ্গাদের নিয়ে। আসল কথা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের দেশত্যাগ করতে হচ্ছে ওযাহাবিবাদ নামক উগ্র ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। উগ্রতা না থাকলে রোহিঙ্গাদের মনে হিংসা আসত না। তার প্রতিহিংসায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও জ্বলে উঠত না। নিজেদের দোষে পীড়িত হয়ে করুণ মুখ দেখলেই কি সবাই ভুলে যাবে? আর এই ভারতে আসার পর এই করুণ মুখগুলোই আবার ক্রূর মুখ হয়ে উঠবেনা সেই গ্যারান্টি কে দেবে? ভারতীয় হিসাবে রোহিঙ্গাদের প্রতি আমাদের খুব বেশী কোনও কর্তব্য থাকতে পারে না। 'আপন দেশের আইন কানুন মেনে উগ্রপন্থী মানসিকতা ত্যাগ করে সরকারের আদেশ মেনে সাধারণ নাগরিক হিসাবে বর্মী সমাজে মিশে যাও আর না হয় ওখানেই প্রাণত্যাগ কর আমাদের দেশে এসো না,' বলা ছাড়া আমাদের আর কোনও কর্তব্য থাকতে পারে না। রোহিঙ্গাদের প্রতি কর্তব্যের আগে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে নিপীড়িত হিন্দুদের প্রতি কর্তব্য আগে করা দরকার। কারণ হল ওরা আমাদের স্বজাতি ও আমাদেরই দেশ বিভাগের যন্ত্রণা ওদের কুরেকুরে খাচ্ছে। রোহিঙ্গা বাদ রাখা হোক। দেখা হোক ভারতবর্ষটাকেই মুসলমানরা আইএস বানাতে চাইছে কিনা।

চার মাসের বিভীষিকা

মরিচঝাঁপির গণহত্যা

দুই যুগের উদ্বাস্তু জীবন শেষে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বাংলাদেশ লাগোয়া সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে শেষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। নির্বাচনে জেতার জন্য উদ্বাস্তুবান্ধব জ্যোতি বসুর বামদলই তাদের ডেকে এনেছিল। জ্যোতি বসু নিজেই এক সময় উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দরবার করেছেন বিধান রায় সরকারের সঙ্গে, নিজের চিন্তভাবনা বাতলেছেন, সম্ভাব্য পুনর্বাসনের রূপরেখা দিয়েছেন যার মধ্যে সুন্দরবনও ছিল। '৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ভিলাইয়ে এক জসভায় জ্যোতি বসু বলেছিলেন, সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে, উদ্বাস্তুদের সেখানে নিয়ে যাবেন। ক্ষমতায় আসার বছর খানেক আগে বামফ্রন্টের শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা রাম চ্যাটার্জি (পরবর্তী কালে যিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন) সহ কয়েক জনকে দন্ডকারণ্যে পাঠিয়ে এসব উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ফেরার আমান্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ কোটি বাঙালী দশ কোটি হাত তুলে তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মালকানগিরিতে রাম চ্যাটার্জি আবেগঘন বক্তৃতায় বলেন,'মাতৃভূমি তোমাদের দু'হাত তুলে ডাকছে, ওরে অবুঝ সন্তান, তোরা ছুটে আয়।' মিঠে সেসব মিথ্যা কথাকে সত্যি ভেবে ভুলেছিল উদ্বাস্তুরা।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে উদ্বেল হয়ে ওঠে উদ্বাস্তুরা। এবার ফিরতে পারবে এমন জায়গায় যেখানে তাদের মত বাংলায় কথা বলে মানুষ। ১৯৭৮ সালের মার্চে সহায় সম্বল যা ছিল বিক্রি করে দন্ডকারণ্য থেকে স্বপ্নের এলডোরাডোতে রওনা হয় দেড় লাখ উদ্বাস্তু। কিন্তু সেখানে অপেক্ষায় ছিল ভিন্ন এক বাস্তবতা। নির্বাচনের আগের বামফ্রন্ট আর ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের কথাবার্তায় তখন ব্যাপক ফারাক। বদলে গেছে তাদের পলিসি। ক্ষমতায় বসেই জ্যোতিবাবুরা ভুলে গেলেন প্রতিশ্রুতির কথা। নেতারা বললেন, 'আমরা বললেই চলে আসতে হবে নাকি!' এরপর পুলিস পিটিয়ে তাড়াল অনেককে, জেলে পুরল অনেককে। ভাঙা হৃদয় নিয়ে ফিরে গেল অনেকে। লাখ খানেক উদ্বাস্তুকে ফেরত পাঠাল দন্ডকারণ্যে। কিন্তু হাজার চল্লিশেক তবু রয়ে গেল মাটি কামড়ে। উদ্বাস্তু সমিতি অনেক আগেই খোঁজখবর নিয়ে বসতি গড়ার জন্য পছন্দ করে এসেছিল মরিচঝাঁপি, যার ঠিকানা দিয়েছিলেন বাম নেতারাই। কলকাতা থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে সুন্দরবনের ১২৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি দ্বীপ -মরিচঝাঁপি। '৭৮-এর শেষ নাগাদ সেখানে ঠাঁই নিলো ৩০ হাজার সর্বহারা মানুষ। দুর্গম দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে বসতি গড়ল তারা। তাঁদের কথা, 'বাঘের পেটে যাব, তবু দন্ডকারণ্যে যাব না।' সরকারকে সাফ জানিয়ে দিল, কোনও সাহায্য লাগবে না, শুধু বাধা না দিলেই খুশি।

এদের কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। জ্যোতি বসু উদ্বাস্তু নেতাদের বললেন, যাচ্ছো ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের কোনওরকম সহায়তা করা হবে না। যা করার নিজেদেরই করে নিতে হবে। উদ্বাস্তুরা মেনে নিয়েছিল তা। সরকার একদম সহায়তা করেনি তাও ঠিক নয়। এদের বেকারি এবং ফিশিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল একরকম মেনে নেওয়ারই নামান্তর। সাত মাসের নিরলস পরিশ্রমে সোনা ফলাল উদ্বাস্তুরা। জমিতে ফসল ফলানোর পাশাপাশি মাছের ঘের তুলে বছরে ২০ কোটি টাকা সরকারকে লাভ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল তারা। মরিচঝাঁপির সাফল্য উঠে এল গণমাধ্যমেও। নিজেরাই সেখানে গড়ে তুলল জনপদ। তৈরি করল রাস্তা, নদী থেকে মাছ ধরে খায়, বড় মাছ পেলে পাশের বাজারে বিক্রি করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তায় নিজেরাই স্কুল তৈরি করল। স্বপ্ন দেখল নতুন করে।

জ্যোতি বসুর অহমে লাগল এটাই। কোনও রকম সরকারি সাহায্য ছাড়া, পার্টির আনুকূল্য ছাড়াই একটা জঙ্গলে একদল অশিক্ষিত ছোটজাতের মানুষ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে এটা হয়ত তাঁর মার্কসবাদের অলিখিত লঙ্ঘন। এবং এটা উদাহরণ হয়ে উঠলে লালদের জন্য ব্যাপক সমস্যা। নির্দেশ পাঠালেন, এদের জায়গা ছাড়তে হবে। অজুহাত দিলেন, এরা সুন্দরবনের পরিবেশ নষ্ট করছে, বাঘের অভয়ারণ্য এদের কারণে বিপন্ন! সব যুক্তিই ছিল অসাড়। কারণ রিজার্ভ ফরেস্টের মানচিত্রে মরিচঝাঁপির ওই জায়গাটুকু অন্তর্ভুক্ত ছিল না কোনও কালেই। সিদ্ধান্তটা সার্বিকভাবে আরএকটু আগেই নেওয়া হয়েছিল। '৭৮-এর জুলাই-সিপিএমের রাজ্য কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল - যেসব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে হলেও তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। শুরু হল নারকীয় তান্ডব। বামফ্রন্টের শরিকদলের নেতাই যাকে বর্ণনা করেছেন 'জালিয়ানওয়ালাবাগকেও হার মানানো তান্ডব' বলে।

বাঘ নয়, বামফ্রন্ট সরকারই খেলো তাদের। রাতের আঁধারে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হল মরিচঝাঁপি থেকে। পাঠিয়ে দেওয়া হল দন্ডকারণ্যে। আর সেই রাতের আঁধারে কত লোক মারা পড়ল তা কেউ জানে না। অভিযোগ আছে বস্তায় করে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় টাইগার প্রজেক্টে, বাঘের খাদ্য হিসাবে। আর বাকিদের ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রের গভীরে।

উদ্বাস্তুরা যখন মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের বাবুরা অনেকেই জানতেন না এসব খবর। কিন্তু অনেকেই জানতেন, খবর রাখতেন। শঙ্খ ঘোষ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় একাধিক কবিতায় মরিচঝাঁপির কথা লিখেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একাধিকবার সশরীরে গিয়েছেন মরিচঝাঁপিতে, আনন্দবাজারে লিখেছেন তাদের দুর্দশার কথা। অনেক সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, মানবাধিকার কর্মীও ছিলেন উদ্বাস্তুদের পাশে। কিন্তু জ্যোতি বসুর সরকার একাই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ধর্মের বলি হওয়া লাখো বাঙালির কান্নার মরিচঝাঁপি, জ্যোতি বসু সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা

শেষাংশ ৮ পাতায়

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

হিজাব পড়া নিয়ে মন্তব্যের জেরেই খুন হয়েছিলেন চট্টগ্রামের নার্সিং কলেজের পরিচালিকা অঞ্জলিদেবী

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের নার্সিং কলেজের পরিচালিকা শিক্ষিকা অঞ্জলি রাণী দেবীকে হত্যার পাঁচ মাস পর মাদ্রাসার এক প্রাক্তন শিক্ষককে গ্রেফতার করল চট্টগ্রামের নগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতের নাম মহম্মদ রেজা, সে পটিয়া আল জামিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক। পুলিশের ধারণা ধৃত ব্যক্তি নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার উল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য।

গত ১০ জানুয়ারি বাড়ি থেকে নার্সিং কলেজে যাওয়ার সময় দুস্কৃতিদের হাতে খুন হয়েছিলেন অঞ্জলিদেবী। সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ চার মুখোশধারী দুষ্কৃতি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল তাঁকে। অঞ্জলিদেবীর গ্রামের বাড়ি সিলেটের মৌলভী বাজারে। চাকরির সূত্রে চট্টগ্রামের চকবাজার তেলিপট্টি গলির বাসিন্দা সাধন কুমার ধর নামে এক ব্যক্তির চারতলা বাড়ির দোতলায় দুই মেয়ে অর্পিতা, অদিতি এবং স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। অর্পিতা এমবিবিএস পাশ করে চমেক হাসপাতালে ইন্টার্ন করছেন। অদিতি ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী।

খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মনে করেছিল পারিবারিক কিংবা পেশাগত কারণে তাঁকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ তদন্তের পর এবং খুনের ধরণ দেখে ধারণা বদলায়। চট্টগ্রাম নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ কমিশনার এসএম তানভির জানিয়েছেন, হিজাব পড়া নিয়ে মন্তব্যের জেরেই হয়ত তাঁকে খুন করা হয়েছে। তানভির জানান, হামলার ধরণ, হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া মুখোশধারী চার যুবক এবং ঘটনার বিশ্লেষণ করে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। সম্প্রতি

খুন হয়েছেন ব্লগার আশিকুর রহমান বাবু। সেই খুনের ঘটনার সঙ্গে অঞ্জলিদেবীর খুনের ঘটনারও মিল খুঁজে পায় পুলিশ। তানভির জানিয়েছেন, ঢাকায় আশিকুর রহমানকেও একই ভাবে খুন করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় ধৃত জিকরুল্লাহ এবং আরিফুলও মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। তারাও ইসলামপন্থী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য। সেই সূত্র ধরেই গোয়েন্দারা প্রাক্তন মাদ্রাসা শিক্ষক মহম্মদ রেজাকে ১৩ মে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, নার্সিং কলেজে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পড়ে আসায় ক্লাশ, পরীক্ষা এবং ওয়ার্ডে ডিউটি সহ নানা ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল। এই নিয়ে অঞ্জলিদেবী কিছু মন্তব্য করেছিলেন। এছাড়া ক্লাশের সময় নামাজ পড়তে বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে তিনি বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ওই মন্তব্যের জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল কলেজ চত্বর। হিজাব পড়া এবং নামাজ পড়ার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল ছাত্রীরা। সেই সময় কিছু ছাত্র বিষয়টিকে আরও উসকে দিয়েছিল। তাদেরই কয়েকজন অঞ্জলিদেবীকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। ওই ঘটনা ঘটেছিল ২০১২ সালের জুলাই মাসে। তাঁরই জেরে এবছর গত ১০ জানুয়ারি তাঁকে খুন করা হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ।

ঢাকার রাজপথে গারো তরুণীকে গাড়িতে দু'ঘন্টা ধরে গণধর্ষণ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে গাড়িতে তুলে ২১ বছরের এক সংখ্যালঘু তরুণীর ওপর পৌনে দু'ঘন্টা ধরে পাশবিক অত্যাচার চালালো পাঁচ দুষ্কৃতি। এখানেই শেষ নয় থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে সারারাত নাকাল হতে হল ওই ধর্ষিতা তরুণী এবং তাঁর অভিভাবকদের। তিন থানায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পরদিন দুপুরে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন তাঁরা।

গণধর্ষিতা ওই তরুণীর বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়ায়। তিনি ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কের একটি পোশাকে দোকানে কাজ করেন। তিনি এবং তাঁর দিদি উত্তরায় মাসির বাড়িতে থাকেন। নির্যাতিতা তরুণীর দিদি জানিয়েছেন, তাঁরা গারো সম্প্রদায়ের এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। কাজ করার পাশাপাশি তাঁর বোন ময়মনসিংহের একটি কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। ঘটনার দিন রাত ন'টা নাগাদ কাজ শেষ করে যমুনা ফিউচার পার্কের উল্টোদিকে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁর ছোটবোন। সেই সময় একটি মাইক্রোবাস তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই যুবক গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে জোর করে তুলে নেয়। গাড়ির ভিতরে আরও তিন জন ছিল। এরপর পাঁচজন মিলে ধর্ষণ করে তাঁকে। বড় বোন জানিয়েছে, সেই সময় মাইক্রেবাসটি ধীর গতিতে চলছিল। কুড়িল বিশ্বরোড এবং যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে দিয়েই কয়েকবার চক্কর কেটেছে বাসটি। প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা ধরে পাশবিক অত্যাচার চালানোর পর পৌনে এগারোটা নাগাদ উত্তরার জসিমুদ্দিন রোডে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

এরপর শুরু হয় হেনস্থার দ্বিতীয় পর্যায়। অভিযোগ জানানোর জন্য ধর্ষিতা তরুণী এবং তাঁর অভিভাবকদের তিন তিনটি থানায় ঘুরতে হয়। এলাকাটি তুরা থানার কাছে বলে রাত চারটে নাগাদ তাঁরা সেখানে যান, কিন্তু থানা থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেটি অন্য থানা

এলাকার মধ্যে পরে। এরপর ভোর পাঁচটা নাগাদ তাঁরা যান গুলশান থানায়। সেখানেও একই উত্তর মেলে। এরপর সাড়ে ছ'টা নাগাদ ভাটারা থানায় গেলে বলা হয় ওসি নেই, অপেক্ষা করতে হবে। প্রায় তিন ঘন্টা অপেক্ষা করার পর সাড়ে ন'টা নাগাদ ওসি আসেন। তারপর আরও তিন ঘন্টা অপেক্ষা করার পর বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ লিখিত ভাবে অভিযোগ জানাতে পারেন তাঁরা। পাঁচ জনের নামে অভিযোগ জানালেও কারও নাম বলতে পারেননি ওই তরুণী। তবে তাঁর দিদি জানিয়েছেন, তাঁর বোন যেখানে কাজ করেন ঘটনার দিন সাতেক আগে এক ব্যক্তি দুই বিদেশিনীকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। মাইক্রোবাসের পাঁচ ধর্ষকের মধ্যে সেই ব্যক্তিও ছিল। দোকানের সিসি টিভির ফুটেজ দেখলে তাকে ও চিনতে পারবে বলে মনে হয়।'

এই ঘটনা জানাজানির পর বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। খবর শুনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র থানায় গিয়ে অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, সংশ্লিষ্টদের গাফিলতি এবং 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' এধরণের অপরাধীদের উৎসাহ যোগাচ্ছে। মানবাধিকার কর্মী খুশি কবীর বলেন, এধরণের ঘটনা ঘটলে কিছুদিন হই চই হয়, তার পর অন্য ঘটনার পিছনে চাপা পড়ে যায়। এই ধারা চলতে থাকায় অপরাধের মাত্রা আরও বাড়ছে। এই ঘটনা খুবই সিরিয়াস এবং অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

১০০ হিন্দু পরিবারকে মূর্তিপুজো বন্ধ করার হুমকি বাংলাদেশে

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত। কখনও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন হিন্দু মা-বোন, কখনও মন্দিরে লুটপাট চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে দেবতার মূর্তি। ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুদের ঘরবাড়ি। এবার মূর্তিপুজো বন্ধ করার হুমকি দিয়ে ভেঙে ফেলা হল লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি এবং মন্দির। ভাঙচুর চালানো হল হিন্দুদের বাড়িতেও। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মূর্তিপুজো বন্ধ না করলে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই ঘটনা বাংলাদেশের লালমণিরহাট জেলার অদিতমারী উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের দাসপাড়া (মাঝিপাড়া) গ্রামের। ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটছে একশটি হিন্দু পরিবারের।

দাসপাড়ায় হামলাকারীরা সকলেই মাদ্রাসার ছাত্র। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় এক নেতা এবং তার অনুগামীরা। হামলার শিকার জিতিন্দ্র নাথ দাস, সেমা চরণ দাস, অতুল চন্দ্র দাস, পরেশ চন্দ্র দাস, ভানু চন্দ্র দাস, বালি চন্দ্র দাস এবং কার্তিক চন্দ্র দাস জানিয়েছেন ২০০ থেকে ২৫০ মাদ্রাসার ছাত্র এবং তাদের সমর্থিত উগ্রপন্থী লোকজন হামলা চালায়। স্থানীয় উগ্রপন্থী হিসাবে পরিচিত ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য নবু ইসলাম হামলাকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিল বলে আক্রান্ত হিন্দুরা জানিয়েছেন। হিন্দুদের মূর্তিপুজো বন্ধ করার জন্যও তিনি শাসিয়েছেন। পরেশচন্দ্র দাস জানিয়েছেন, 'গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এই গ্রামের হিন্দুরা নবু ইসলামকে ভোট দেয়নি। সে জন্যই তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে হামলা চালিয়ে সুকৌশলে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন।' তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই সব অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন নবু ইসলাম। তাঁর দাবি ওই ঘটনার জন্য মাদ্রাসার ছাত্র এবং হিন্দুরাই দায়ী। তিনি শুধু চেষ্টা করেছিলেন ওই ঝামেলা থামাতে।

আক্রান্ত হিন্দুরা জানিয়েছেন, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে পুজোর জন্য নতুন মূর্তি আনা হচ্ছিল।

রাস্তা দিয়ে মূর্তি নিয়ে আসার সময় স্থানীয় কদমতলা হাফিজিয়া মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। কয়েকজন হিন্দু তার প্রতিবাদ জানায়। তার কিছুক্ষণ পরেই মাদ্রাসার ছাত্ররা লাঠিসোঁটা নিয়ে হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মন্দিরে ঢুকে দেবতার মূর্তি ভেঙে ফেলে। মন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা শুরু করে। ওই গ্রামে ১০০টি হিন্দু পরিবারের বাস। প্রাণ বাঁচাতে শিশু-বৃদ্ধ সকলকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের পালিয়ে যান তাঁরা। পরে পুলিশ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় বাড়ি ফিরে এলেও ফের আক্রমণের আশঙ্কায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা।

জিতিন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, মাদ্রাসার ছাত্ররা তাঁদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে এলাকায় থাকতে হলে মূর্তিপুজো ছেড়ে দিতে হবে। কারণ মাটির মূর্তি কখনই কথা বলে না, আর এসব মূর্তি দেখলে মুসলমানদের পাপ হয়। আমরা যদি মূর্তিপুজো করি তাহলে গ্রাম থেকেই উচ্ছেদ করার হুমকি দিয়েছে।

সারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনসুর আলি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, বিষয়টি মীমাংসার জন্য স্থানীয় ভাবে চেষ্টা চলছে। লালমণিরহাট পুলিশ সুপার টি এম মোজাহিদুল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখল বাংলাদেশ শীর্ষ আদালত

'৭১-এর বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধে সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের মদতদাতা আল বদরের প্রাক্তন কমাণ্ডার আলি এহসান মহম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির সাজা বহাল রাখল বাংলাদেশ শীর্ষ আদালত। রায় ঘোষণার পর ঢাকার শাহবাগে সাধারণ মানুষকে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে। কিন্তু ওই রায়ের বিরুদ্ধে ১৭ জুন দেশজুড়ে ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করেছে জামাত - ই - ইসলামি। উল্লেখ্য জামাত - ই - ইসলামির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন মহম্মদ মুজাহিদ।

২০১৩ সালে মুজাহিদকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল। রায় ঘোষণা করতে গিয়ে ট্রাইব্যুনাল বলেছিল, মুক্তির পক্ষে লড়া বাঙালী নাগরিকদের হত্যার জন্য আল বদরকে কাজে লাগানোয় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল মুজাহিদের। তার বিরুদ্ধে আনা ৭টি অভিযোগের মধ্যে ৫টিই প্রমাণিত হয়েছে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন যুদ্ধাপরাধে দোষী সাব্যস্ত এই জামাত নেতা। কিন্তু গত ১৬ জুন মঙ্গলবার সেই আবেদন খারিজ করে দেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনা যখন পরাজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের উপর নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল মুজাহিদের নেতৃত্বে আল বদর গোষ্ঠী। বাংলাদেশের বরচক গ্রামে এক রাতে সমস্ত সংখ্যালঘু হিন্দু পুরুষকে হত্যা করে আল বদর, অসংখ্য হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। এরকম গণহত্যাকারী যে ক্ষমার অযোগ্য তাই-ই রায়দান কালে শীর্ষ আদালত জানায়। রায় শোনার পর বরচকের মানুষরা আনন্দে ফেটে পড়ে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা উলুধ্বনি দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে ও একে অপরকে মিষ্টি বিতরণ করে তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে কালী মন্দিরে ভাঙচুর ও আগুন

গত ২২ মে গভীর রাতে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার সিংজুরি গ্রামে কালী মন্দিরে তিনটি মূর্তি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিল দুস্কৃতিরা। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে স্থানীয় সিংজুরি ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আক্কাস আলি এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে। মন্দির কমিটির সভাপতি গৌড়চন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, সিংজুরি বাজারে ৬ শতক জমির ওপর সর্বজনীন কালীমন্দিরটি অবস্থিত। গত তিন বছর ধরে মন্দিরের ওই জমির মালিকানা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আক্কাস আলির ছেলে আল মামুনের সঙ্গে মন্দির কমিটির বিরোধ চলছে। গত বছর মানিকগঞ্জের একটি আদালত মন্দির কমিটির পক্ষে রায় দেয়। গৌড়চন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, তার পরেও মামুন বিভিন্ন ভাবে মন্দিরের জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই শুক্রবার গভীর রাতে মন্দিরের তিনটি মূর্তি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিস আক্কাস আলি এবং তার ছেলে আল মামুনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে।

জয়নগরে হিন্দু ধর্মস্থান নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে মারধর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকার বিজয়নগর গায়েনপাড়া। পাড়াতে রয়েছে বুড়োবাবার থান, যেখানে হিন্দুরা নিয়মিত পুজো দেন। স্থানীয়দের ইচ্ছা বুড়োবাবার থানে তাঁরা একটি পাকা মন্দির করবেন। তাই একটি অলিখিত নিয়ম রয়েছে পাড়ার কেউ বাড়ি-ঘর তৈরির জন্য ইট আনলে তাঁকে বুড়োবার থানের জন্য ৫/৭ টা ইট দিতে হবে। বিনিময়ে ঠাকুরে থানের পাশের ফাঁকা জমিতে ইট রাখতে পারবে। গত ১১ মে তুফান শেখ নামে এক ব্যক্তি ওই মন্দিরে পাশে ভূধর গায়েনের ফাঁকা জমিতে ইট নামাতে শুরু করে। ভূধর গায়েনের অনুমতি ছাড়াই তাঁর জায়গায় ইট নামানোতে অসন্তুষ্ট ভূধর আপত্তি জানান। তিনি বলেন, মন্দিরের জন্য ৫/৭ টা ইট দিলে তবেই তিনি তাঁর জমিতে ইট নামাতে দেবেন। কিন্তু তুফান শেখ তার অনড় অবস্থান থেকে জানিয়ে দেয় একখানা ইটও সে হিন্দুদের মন্দিরের জন্য দেবে না। এই নিয়ে বাকবিতন্ডা চলার সময়েই তুফান শেখ হিন্দু দেবতার নামে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। তার এই কটূক্তির প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন হিন্দু সংহতির কয়েকজন যুবক। এই অবস্থায় তুফান শেখের ভাইপো বাবলু শেখ ফোন করে মুসলমান পাড়া থেকে লোকজন ডাকে। মুহূর্তের মধ্যে ৭০-৮০ জন জড়ো হয়ে ভূধর গায়েনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাল্টা প্রতিরোধ করেন হিন্দু সংহতির জনা কুড়ি যুবক। প্রতিরোধ করতে গিয়ে গুরুতর আহতও হন অনেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু যুবকদের প্রতিরোধে পিছু হঠতে বাধ্য হয় হামলাকারীরা।

৬ পাতার শেষাংশ

মরিচঝাঁপির গণহত্যা

আর নৃশংসতার মরিচঝাঁপি, বাঘের মত মনোবল নিয়ে তবু বেঁচে থাকা বাঙালী হিন্দুর বার বার মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার মরিচঝাঁপি, আমাদের খুব অন্তর্গত বেদনা, কান্না আর লজ্জার মরিচঝাঁপি।

সাতচল্লিশের ভারতে নমশূদ্ররা যায়নি। অধিকাংশই থেকে গিয়েছিল পাকিস্তানে। কী নির্মম নির্যাতন সহ্য করে থেকেছে - মারা গেছে - শেষমেশ চলে গেছে ভারতে - মরিচঝাঁপির মত এলাকায়। একাত্তরের লবণহ্রদে এই নমশূদ্ররা পশুর চেয়েও অধম জীবন যাপন করেছে। তখন মৃত্যু ছিল নিত্যসঙ্গী।

নমশূদ্রের সঙ্গে প্রতারণা করেছে - সবাই। ব্রিটেন, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ - কে করেনি তাঁদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার!

বাম রাজনীতিক জ্যোতি বসু তো সাম্যবাদী নেতা ছিলেন! এই ছিলো তাঁর সাম্যবাদের নমুনা!

১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে শুরু উৎখাতের প্রথম পর্যায়। ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হল অর্থনৈতিক অবরোধ। ৩০টি লঞ্চ অধিগ্রহণ করে মরিচঝাঁপিকে ঘিরে ফেলল জ্যোতি বসুর পুলিস। সংবাদমাধ্যমের জন্য জারি হল নিষেধাজ্ঞা- মরিচঝাঁপি তাদের জন্য অগম্য এবং নিষিদ্ধ। এ নিয়ে কিছু লেখা যাবে না, বলাও যাবে না। উদ্বাস্তুদের টিউবয়েল থেকে শুরু করে ক্ষেতজমি, মাছের ঘের, নৌকা সব নষ্ট করে ফেলা হল। বৃষ্টির জল ধরে রেখে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল তারা, সেখানে বিষ মেশানো হল। সে বিষে মরল অসংখ্য শিশু। বাইরে থেকে খাবার আনার জো নেই, রসদ পাওয়ার কোনও উপায় নেই। ৩১ জানুয়ারি, কিছু যুবক মরিয়া হয়ে পাশের কুমিরমারি থেকে খাবার আনতে সাঁতরে পুলিসের ব্যারিকেড ভাঙল। পুলিশের গুলিতে মরতে হল তাদের ৩৬ জনকে। মানুষ ততদিনে বাঁচার জন্য ঘাস খেতে শুরু করেছে!

বিপন্ন এই মানবিকতায় উদ্বিগ্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের যারাই সাহয্যের হাত বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের সে হাত ঠেকিয়ে দিয়েছে বামফ্রন্ট - সরকারি এবং দলীয় তরফে। 'মাদার টেরাসা' পর্যন্ত জানালেন, আক্রান্ত মরিচঝাঁপিতে কিছু করতে তিনি অপারগ। সাহায্যপ্রার্থী সুব্রত চ্যাটার্জিকে বললেন, 'সূর্যি উই কান্ট গো, নাইদার উই কান এক্সপ্লেইন হোয়াই উই কান্ট'। এদিকে অনাহারে মরতে শুরু করেছে মানুষ। যা-তা খেয়ে অসুখে মরছে শিশু এবং বৃদ্ধরা। গুলিতে যাদের মারা হচ্ছে, তাদের লাশ গুম করে ফেলা হচ্ছে। হয় লঞ্চে তুলে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, নয়ত ডাম্প করা হচ্ছে টাইগার প্রজেক্টে - বাঘের আহার যোগাতে। জ্যোতি বসু ওদিকে সংবাদমাধ্যমে বলে চলেছেন, 'সুন্দরবনে এসব উদ্বাস্তু আসলে সিআইএ-র চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে, তারা সশস্ত্র ট্রেনিং নিচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে লোক এসে এখানে আশ্রয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ঘাত ঘটানোর ষড়যন্ত্র করছে বলে তাঁর কাছে পাকা খবর আছে।

মে মাসের শুরুতে যাকে বলে ফাইনাল অ্যাসল্ট। কাহিনিটা খতম করার সিদ্ধান্ত নিলেন জ্যোতি বসু। পুলিসের হাত শক্ত করতে যোগ দিল সিপিএম ক্যাডাররা। পার্টির নির্দেশ বলে কথা! আশেপাশের দ্বীপগুলিতে কঠোর আদেশ জারি হল - এতদিন যা সাহায্য করার করেছো, খবরদার আর নয়। ১৩ মে মরিচঝাঁপিতে নরক ভেঙে পড়ল। গভীর রাত থেকে সেখানে শুরু হল বর্বর নৃশংসতা। টানা তিন দিন চলল আক্রমণ। নৌকা করে লোক যখন পালাচ্ছে তখন তার ওপর লঞ্চ তুলে দেওয়া হল। লাশ গুম করা এবং নৌকা ভাঙার জন্য থাকল আলাদা পুরস্কার - নগদ টাকায়। লেলিয়ে দেওয়া পার্টিজান গুণ্ডারা ঘরে ঘরে আগুন দিল, সামনে যে পড়েছে তার ওপর চলল আঘাত, নারী হলে তাঁকে হতে হল ধর্ষিতা। আগুনে পুড়ে ছাই হল শখানেক শিশু। তাদের তুলে আনার সময়ও দেওয়া হল না মায়েদের। পলায়নপরদের ওপর গুলি চলছে পুলিসের। যেন দুঃস্বপ্নের একাত্তরই ফিরে এল মরিচঝাঁপির ওই বাঙালী উদ্বাস্তুদের ওপর। তফাৎ একটাই, আক্রান্ত এবং আক্রমণকারীরা ধর্মেও এক ভাষায়ও। অবশেষে সাফ মরিচঝাঁপি। গোটা এলাকায় আর কোনোও ঘর নেই যা দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বংসস্তুপ কথাটার অক্ষরিক এক প্রদর্শনী চারিদিক জুড়ে। পোড়া ছাইয়ের মাঝে হয়ত উঁকি মেরে আছে ঘুমের মধ্যেই লাশ হয়ে যাওয়া কোনও শিশুর রোস্ট। সরকারি নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপে হতাহতের সঠিক সংখ্যাটা আজও অজানা। কারও মতে শয়ে শয়ে, কারও মতে হাজারে হাজারে। লাশ জলে ভেসে গেছে, বাঘে খেয়েছে, তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। সাংবাদিক তুষার ভট্টাচার্য তাঁর এক প্রামাণ্য চিত্রে একটা হিসাব দিয়েছেন অবশ্য। অবরোধ শুরুর দিন ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৩ মে পর্যন্ত অনাহারে ৯৪ জন এবং বিনা চিকিৎসায় ১৭৭ জন শিশু মারা গেছে। ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ২৪ জন, মারা গেছেন ২৩৯ জন। অনাহারে আত্মহত্যা করেছেন ২ জন। আহত ১৫০, নিখোঁজ ১২৮ জন এবং গ্রেফতার হয়ে জেলে গেছেন ৫০০ জন। অন্যান্য ভাষ্যে সংখ্যাটা কয়েকগুণ। এদের অনেকেই দন্ডকারণ্যে আবার ফিরে গেছেন। কেউবা পালিয়ে কলকাতায় এসে ফুচকা বিক্রি বা হকারি করছেন। অনেকেই জানেন না তাঁর স্বজনদের কে কোথায় আছে, বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে? মেয়েরা হয়ে গেছে পতিতা।

ইসলামি সন্ত্রাস দেখে স্তম্ভিত হল বিশ্ব

রমজান মাসের জুম্মাবারে মুসলিম সন্ত্রাসে কেঁপে উঠল গোটা বিশ্ব। ২৬ জুন শুক্রবারে একই সঙ্গে তিউনিসিয়া, কুয়েত, ফ্রান্স তিনটি দেশে বর্বর হামলা চালালো জেহাদিরা। তিউনিসিয়ার সৈকত শহর সুসারে দুটি রিসর্টে জঙ্গি হামলায় মারা গিয়েছেন ৩৭ জন পর্যটক। কুয়েতের রাজধানী কুয়েত সিটির এক মসজিদে মানববোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন ২৫ জন আহত দু'শতাধিক। তৃতীয় হামলাটি হয় দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গ্যাস কারখানায়। সেখানে একজনকে গলাকেটে খুন করা হয়েছে এবং আহত হয়েছে দু'জন।

সৈকত শহর সুসাতে ২৬ জুন বেলা ১২টা নাগাদ পর্যটকদের ভিড়ে মিশে থাকা দুই জঙ্গি কলাশনিকভ হাতে ঢুকে পড়ে দু'টি রিসর্টে। এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে তারা। গুলিতে একে একে মত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পর্যটকরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন বিভিন্ন হোটেলের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরা। তাদের সঙ্গে পরে যোগ দেয় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে এক জঙ্গির মত্যু হলেও অন্যজন পালিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে দুই জঙ্গির হাতে নিহত হয়েছেন ৩৭ জন।

জেহাদিদের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল কুয়েত সিটির একটি শিয়া মসজিদ। সেখানেও বেলা ১২টা নাগাদ হামলা চালানো হয়। মসজিদে তখন জুম্মাবারের নামাজের জন্য জড়ো হয়েছেন হাজারখানেক শিয়াসম্প্রদায়ের মুসলিম। সেই সময় বছর তিরিশের এক আইএস জঙ্গি আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের এবং আহত হয়েছেন ২০২ জন। বিস্ফোরণে মসজিটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই শিয়াদের খাঁটি মুসলমান বলে মনে করে না আইএস জঙ্গিরা। শিয়াদের বরাবরই নিজেদের শত্রু বলে মনে করে তারা। কোরান মতে পবিত্র রমজান মাসে শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী হানা, শিয়াসম্প্রদায়ের প্রতি বারবার নৃশংস আক্রমণই প্রমাণ করে। আজ সুন্নি সম্প্রদায়ের আক্রমণের শিকার শিয়াদের কি মনে পড়বে তারাও একইরকম অসহিষ্ণু মানসিকতা নিয়ে সলমন রুশদিকে সারা পৃথিবী জুড়ে তাড়া করে বেড়িয়েছিল?

দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের সঁ কোয়াতঁ ফ্যালভিয়ে শহরের একটি গ্যাস কারখানায় হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেখানে গাড়ি নিয়ে তীব্র গতিতে ঢুকে পড়ে একটি গ্যাস ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারার চেষ্টা করে জঙ্গিরা। কিন্তু তার আগেই এক জঙ্গি ধরা পড়ে যায়। তার স্ত্রীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কারখানা চত্বর থেকে এক ব্যক্তির কাটা মুণ্ডু উদ্ধার হয়। মুণ্ডুর পাশেই পড়েছিল আরবি ভাষায় লেখা একটি পতাকা।

কম্যুনিষ্ট শাসিত চিনে মুসলমানদের রোজা নিষিদ্ধ

এবার রমজান মাসে রোজা রাখতে পারল না চিনের ঝিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়। এব্যাপারে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে সে দেশের সরকার। রমজান মাস শুরুর আগেই সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, উইঘুর জনগোষ্ঠীর মুসলিমরা এবার রমজান মাসে রোজা রাখতে পারবে না। এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুমকি দিয়েছে মুসলিম নেতৃত্ব।

উইঘুর জনগোষ্ঠীর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সমাবেশ লক্ষ্য করে বিচ্ছিন্নতাবাদী উইঘুর জনগোষ্ঠীর মুসলিমরা হামলা চালিয়েছে বলে চিনের অভিযোগ। তবে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছে উইঘুর জনগোষ্ঠীর মুসলিমরা।

মসজিদে মাইক ঃ উত্তাল মছলন্দপুর

মসজিদে মাইক লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের শিবপুর এলাকা। মাইক লাগানোর বিরোধিতা করায় বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় পথ অবরোধ করে মুসলমানরা। হিন্দুদের বেশ কিছু দোকানেও ভাঙচুর চালায়। প্রতিবাদে হিন্দুরাও পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

শিবপুর এলাকাটি মছলন্দপুরের নিকটে হলেও বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত। এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত। দেশভাগের আগে অবশ্য শিবপুরে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বিনিময় প্রথার মাধ্যমে এখানকার মুসলিমরা বাংলাদেশে চলে যায় আর বাংলাদেশের হিন্দুরা এখানে এসে বসবাস শুরু করে। তখন থেকেই এলাকায় একটি মসজিদ রয়েছে। এলাকায় কোনও মুসলিম না থাকায় জরাজীর্ণ মসজিদটিতে নিয়মিত নামাজও পড়া হয় না। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে এসে মুসলমানরা সেখানে নামাজ পড়ে। এবার রমজান উপলক্ষে আশেপাশের মুসলমানরা ওই মসজিদে চারটি মাইক লাগায়। নামাজ পড়াতে আপত্তি না থাকলেও মাইক লাগানোতে স্থানীয় হিন্দুরা আপত্তি করে। মসজিদের কাছেই রয়েছে একটি প্রাথমিক স্কুল, সেখান থেকেও আপত্তি জানানো হয়। কিন্তু সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে মসজিদে মাইক বাজতে থাকে। এরপর স্থানীয় হিন্দুরা বিশেষত মহিলারা থানায় বিক্ষোভ দেখায়। হিন্দুদের প্রবল প্রতিবাদে পুলিশ শেষ পর্যন্ত গত ১৯ জুন মসজিদ থেকে মাইক খুলে দেয়।

এই ঘটনার পরদিন শিবপুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রামচন্দ্রপুরে পথ অবরোধ করে মুসলিমরা। কারণ ওই এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। একই সঙ্গে স্বরূপনগর বাসস্ট্যান্ড, ক্যাওসা বাজার এবং হুগলির মোড়েও দীর্ঘ সময় অবরোধ করে। ক্যাওসা বাজারে হিন্দুদের কয়েক টি দোকান ভাঙচুর করে। এই অবস্থায় হিন্দু ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে পালিয়ে গেলেও তপন দাস নামে এক ব্যক্তি তাঁর মিষ্টির দোকানে আটকে পরেন। দোকান বন্ধ করে তিনি ভিতরেই থেকে যান। সেই সময় তাঁর দোকান ভাঙচুর করারও চেষ্টা করা হয়। অবশেষে প্রায় ছ'ঘন্টা পর তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ।

মুসলমান সম্প্রদায়ের এই অবরোধ বিক্ষোভের পর হিন্দুদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই মসজিদে মাইক লাগানোর অনুমতি দেয় পুলিশ। প্রতিবাদে পর দিন সকালে শিবপুর মোড়ে দীর্ঘ সময় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দুরা। এলাকায় কোনও মুসলমান বসতি না থাকা সত্ত্বেও মসজিদে মাইক লাগানোর অনুমতি দেওয়ায় ফুঁসছে স্থানীয় হিন্দুরা।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686